ময়ূরী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা - ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, এন্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

বেঁধেছেন : জি রায় এন্ড কোং
২২, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : দীপেন বসু

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

মূল্য : তিন টাকা

প্রীতিভাজনেষু—

শ্রীদীপেন বসুকে

সূচীপত্র

॥ ময়ূরী ॥

কুমারীর সিঁথির মত পথের রেখাটি অনেক দূরে চলে গিয়েছে। রাস্তার এ-পার থেকে ও-প্রান্ত দেখা যায় না। অন্ত দেখে দরকারই বা কী! বরং ঝোপের আড়ালে পথটিকে হঠাৎ হারিয়ে যেতে দেখতেই ভাল লাগে। কোল-ঘেঁষে লম্বা ঝিলটি এই দুপুর-রোদেও শান্ত স্তব্ধভাবে পড়ে আছে। এদিকে কয়েক গজ দূরে অবিরাম বাস-চলাচলের শব্দে ঝিলের জল ক্ষণিকের জন্যও কেঁপে উঠছে কিনা এখান থেকে বোঝবার জো নেই। পশ্চিমের পুরনো প্রায়পরিত্যক্ত রাজবাড়ির ছায়া ঝিলের জলে পড়েছে কিনা তাও এখান থেকে দেখা যায় না। বাঁয়ে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। ঠিক সারিবদ্ধ নয়। যার যেখানে খুশি, আশ্রয় খাড়া করেছে। গড়নের মিল নেই, রঙের মিল নেই। তবু আস্তে আস্তে নতুন একটি বসতি ত হ'ল। শহরের নানা অঞ্চলের মানুষ কিছুদিন পর থেকে এখানে মিলে মিশে বাস করবে। যাদের সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না, তারা পরিচিত হবে, পরস্পরের প্রতিবেশী হবে। কেউ কেউ বন্ধু হবে। বন্ধুত্ব বড় মধুর। রাজেশ্বর ক'বছর আগেও তার বন্ধু পূর্ণেন্দুকে নিয়ে এখানে স্কেচ করতে এসেছে। তখন শুধু খোলা মাঠ ছিল। এ-সব বাড়িঘর তখন ওঠেনি। আর ওই যে সরু সাদা পথটুকু তারও দেখা মেলেনি। ঝিলের পাশে বসে বসে তারা সকাল-সন্ধ্যায় স্কেচ করেছে, হেঁটে বেড়িয়েছে। এখন আর তার জো নেই। এখন ওখানে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসলে চারদিকে ভিড় জমে যাবে।

পূর্ণই প্রথম আবিষ্কার করেছিল জায়গাটা। রাজেশ্বরের পাড়া। কিন্তু অন্য পাড়া থেকে এসে সেই ঝিল আর মাঠ পূর্ণেরই প্রথম চোখে পড়েছিল। সেই দৃষ্টি এখন অবশ্য সরে গিয়েছে। যাতায়াতের পথে জায়গাটা চোখে পড়লে ও আজকাল বিরক্ত হয়ে বলে, "কী চমৎকার ল্যান্ডস্কেপই না ছিল, গেঁয়ো শহরের গহ্বরে।"

রাজেশ্বর প্রতিবাদ করে না, সায়ও দেয় না। ভাবে শুধু কি ফাঁকা মাঠেরই রূপ আছে! নতুন পল্লীর রূপ নেই? রূপ নেই নতুন নতুন মানুষের, শিশু, যুবক, বৃদ্ধের? রূপ নেই তাদের ঘর-সংসারের, সুখ-দুঃখের, হাসিকান্নার?

অথচ পূর্ণ সেই সংসারের কথাই বলছিল এতক্ষণ। স্ত্রীর ফের সন্তান হবে। তাকে হাসপাতালে দেবে, না, নার্সিং হোমে দেবে এখনও ঠিক করতে পারেনি। মেয়ের প্রাইভেট টিউটরটি চলে গিয়েছে। তার জন্যে নতুন টিউটর

চাই। আরও নানা পারিবারিক সমস্যা। ছবির আলোচনা আজ খুব কমই হয়েছে। পূর্ণ সংসারের মধ্যে ডুবে আছে বলেই সংসারের রূপ যেন ওর চোখে পড়ে না। ওর চোখ ওর মন কেবল সংসার থেকে পালাই-পালাই করে।

পূর্ণ বলে, "তোমার কী! চল্লিশ পেরিয়ে গেল। বিয়ে-থা করলে না, সংসারের ঝামেলা যে কী বস্তু জানলে না বুঝলেও না। বেশ আছ, দায়িত্ব নেই, ভাবনা নেই। ছবি ছাড়া তোমার আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই।"

রাজেশ্বর হাসে। বন্ধুর কথার জবাব দেয় না। কিন্তু মনে মনে ভাবে, তা যেমন নেই, তেমনই অনেক কথা অজানা রয়ে গিয়েছে। সংসারের অনেক বাসনা-কামনাকে তুলির রঙে আঁকতে আঁকতে রাজেশ্বরের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ঠিক হচ্ছে ত? নাকি কেউ ফাঁকি ধরে ফেলবে! বলবে, কোন অভিজ্ঞতা নেই, সব আন্দাজের ব্যাপার! কেউ অবশ্য বলেনি। বরং অনেকে ধরে নেয় তার সব অভিজ্ঞতা আছে। তারা জানে না রেখা আর রঙ তার একমাত্র বন্ধন, রেখা আর রঙ তার একমাত্র মুক্তি।

পূর্ণেন্দুকে যে বাসটায় তুলে দিয়েছে রাজেশ্বর, তারপরে আরও দুটো বাস চলে গেল। এবার ফিরতে হয়। ফিরবে? নাকি এই বড় রাস্তা পেরিয়ে ওই সরু সিঁথির বীথিকার দিকে এগোবে? ঝিলের ধার দিয়ে হেঁটে চলবে? নাকি একটুখানি থেমে তার শান্ত স্থির জলে নিজের দুটি চোখকে ডুবিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

"এই বাস, বাঁধকে, বাঁধকে। এই কণ্ডাক্টার। যাঃ, চলে গেল!"

পূবমুখী বাসটা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। তার গতি থামল না। কিন্তু রাজেশ্বর যেতে যেতে থেমে দাঁড়াল। মেয়েটি তৎক্ষণে পার হয়ে এপারে এসেছে। প্রায় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে দুখানা বই, একটি খাতা। পিঠে দীর্ঘ বেণী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটি চমৎকার মানিয়েছে। ও-রঙের সঙ্গে নীল মানাত, ফিকে হলুদ মানাত, এমন কি গাঢ় লালও বেমানান হত না। রেড ব্লু, ইয়োলো। তিন প্রধান। আর্টিস্টের তিনরঙা পতাকা। না, তার পতাকা বহুবর্ণের। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্বিতীয় বাসের প্রতীক্ষায়। বোঝা যাচ্ছে ওর কলেজ শহরে নয়, শহরের বাইরে। রাজেশ্বর ওর সান্নিধ্য থেকে আরও দু পা সরে এল। কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারল না।

চমৎকার ফর্ম। দীর্ঘাঙ্গী। কত হবে? সাড়ে পাঁচ। না হলেও পাঁচ পাঁচ। তার কম ত নয়ই। ও যখন রাজেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওর কাঁধ পর্যন্ত উঠেছিল মেয়েটির মাথা। মসৃণ চিক্কণ ঘন কালো চুলের মাঝখানে সুন্দর সাদা একটি রেখার ইশারা। বাঙালী মেয়ের এত দৈর্ঘ্য বড়-একটা

দেখা যায় না। যা দু-একজনকে চোখে পড়ে, গড়ন ভাল পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মেয়েটি সব দিক থেকে ব্যতিক্রম। দীর্ঘাঙ্গী হয়েও ক্ষীণমধ্যা আর স্তবকভারে আনতা। রাজেশ্বর একবার যে কুমারসম্ভব থেকে উমার ছবি এঁকেছিল, তার সঙ্গে অবিকল মিল আছে। সেই স্তবকভার-নম্রতার সঙ্গে। আশ্চর্য, তার পরিকল্পিত মুখের ডৌলটির সঙ্গেও অপূর্ব সাদৃশ্য। সেই ওভ্যাল শেপের মুখ, সেই নাক ঠোঁট চিবুক। সেই জন্যেই মুখখানা চেনা-চেনা মনে হয়েছিল রাজেশ্বরের। মনে পড়েনি এ তারই মনগড়া মূর্তি। পূর্ণ কিন্তু সেই ছবিটা প্রকাশ করতে দেয়নি। বলেছিল নন্দলাল বসুর বড় ছাপ রয়ে গিয়েছে। তা ত থাকবেই। সেই প্রথম আমলের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ছবি সামনে রেখে কখনও বা শুধু স্মৃতির দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে তখন হাত মকশ করা চলেছে। একলব্যের গুরু ছিলেন একজন, আচার্য দ্রোণ। রাজেশ্বরও একলব্য। আর্টের কোন স্কুল-কলেজে সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। প্রত্যক্ষ কোন শিল্পগুরুর কাছেও শিক্ষা নেয়নি। শুধু তাঁদের হাতের কাজ দেখেছে। মাসিকপত্রিকা থেকে সস্তা সব প্রিণ্ট ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের বাক্সে জড়ো করেছে। তারপর গোপনে বসে বসে সেই সব ছবিতে চোখ বুলিয়েছে, মন বুলিয়েছে, তারপর বসেছে রঙ তুলি নিয়ে। একলব্যের গুরু ছিলেন একজন। রাজেশ্বরের অনেক। একালের সেকালের, এদেশের ওদেশের। প্রথম প্রথম চলেছে শুধু অনুকরণ-অনুসরণের পালা। কিন্তু শুধু কি তাই! রাজেশ্বরের নিজস্ব বলতে কি কিছুই তার মধ্যে ছিল না? তিল-প্রমাণ, বিন্দুপ্রমাণ থাকলেও ছিল। নিজের শ্রমের মধ্যে, স্বেদের মধ্যে, নতুন পথ কেটে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের মধ্যে রাজেশ্বরের মৌলিকতার বাসনা মিশে ছিল। সেই প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে আজ আর কোন লজ্জা নেই, খেদ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে নেই। বরং এক অপূর্ব প্রসন্ন আনন্দে তার মন ভরে উঠেছে। সেই প্রস্তুতিপর্ব আজও শেষ হয়নি। বলতে গেলে সারা জীবনই এক উদ্যোগ-পর্ব। সে উদ্যোগ, সে উদ্যম শুধু শিল্প সৃষ্টির জন্যে—এই একমাত্র আশ্বাস আর গৌরব রাজেশ্বরের।

আর-একটা বাস এসে পড়েছে। মেয়েটি হাতখানা উঁচু না করলেও বাসটি থামল। এখানেই স্টপ। কিন্তু হাতের ওই ডৌল আর ওই দীর্ঘ আঙুলগুলি দেখতে পেত না রাজেশ্বর। অমন ভঙ্গিতে পেত না। ওই আঙুলগুলি শুধু তুলিতে এঁকে রাখবার মত না—ওই আঙুলে তুলি ধরলেও বেশ মানায়। ডান হাতের মনিবন্ধে সোনার বালা, বাঁ হাতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট ঘড়ি। ঘড়ির সঙ্গে সোনার বালা কিন্তু মানায়নি। রাজেশ্বরের মতে একটু বিসদৃশ হয়েছে। বাঁ হাতেও যদি আর-একটি বালা পড়ত, তা হলে ঘড়িটি ঢেকে যেত। কিন্তু

সিমেট্রি থাকত। আজকাল অনেক মেয়েই অবশ্য হাতে কিছু পরে না। হাতে নয়, কানে নয়, গলায় নয়। যৌবনই তাদের একমাত্র আভরণ। রাজেশ্বর কি এঁকেছে এ যুগের নিরাভরণা যৌবনাভরণাকে?

বাসটি ছেড়ে চলে গেল। মেয়েটি ঠিক জানলার ধারে বসেছে। বাসে কি ট্রেনে উঠলে জানলার ধারটি এখনও রাজেশ্বর নিজের জন্যে বেছে নেয়। অনেক সময় ছেলেমানুষের মত সহযোগীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি পর্যন্ত করে। রাজেশ্বর হাসল।

"বাবু!"

রাজেশ্বর চমকে পিছনে তাকাল।

পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। দোকানীর পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। দাঁতগুলি কালো কালো।

দোকানী হেসে বলল, "বাবু, আজ কিছু নিলেন না?"

রাজেশ্বর বলল, "কী নেব! তোমার দোকানের কিছুই ত আমার চলে না। মাঝে মাঝে বন্ধুদের জন্যে নিই।"

দোকানী বলল, "আজও আপনার সেই বন্ধু এসেছিলেন?"

রাজেশ্বর বলল, "হ্যাঁ।"

"তাঁকে বাসে তুলে দিলেন?"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "তুমি দেখছি সব খবর রাখ।"

দোকানী বলল, "দেখলাম যে। তিনি অনেকক্ষণ চলে গেছেন না বাবু?"

রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে দোকানী ফের একটু মুখ মুচকে হাসল। তারপর মুখ নিচু করে বিড়ি বাঁধতে লাগল।

তার সেই হাসি, তার সেই ভঙ্গি, রাজেশ্বরের সমস্ত মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। ঘৃণায় ভয়ে অপমানে অস্থির হয়ে উঠল রাজেশ্বর। ছি-ছি-ছি, ও ভেবেছে কী! ও কি ভেবেছে ওদের চোখ আর রাজেশ্বরের চোখ এক? ও যে চোখে তাকায় রাজেশ্বরও সেই চোখে তাকায়? ওর ওই হাসি-হাসি মুখের উপর রাজেশ্বর যদি একটা ঘুষি ছুঁড়ে দিত, তা হলে কী হত? সেই শক্তি রাজেশ্বর রাখে। শুধু তুলি ধরবার মত নরম আঙুল কটি নিয়েই সে বাস করে না, বাস করে না তুলোর মত, মোমের মত শরীর নিয়ে। শালগাছের মত শক্ত সবল আর দীর্ঘ তার দেহ। তার তুলির টানের যেমন জোর তেমনই জোর কব্জির। রাজেশ্বর একটি ঘুষি দিলে ওই কালো কালো সব কটি দাঁত খসে যেত।

নিজের দৈহিক শক্তির চেতনায় রাজেশ্বর আত্মপ্রসাদ ফিরে পেল। ফিরে এল মানসিক প্রত্যয়। মনে মনে হাসল রাজেশ্বর। দুর্বল বিকল দেহে

ভীরু তার বাস। বিকৃতির বাসা। তার দেহ ত দুর্বল নয়। তার ভয় কিসের! অমন একটা কেন, পাঁচটা বিড়িওয়ালার মাথা সে নিতে পারে।

খানিকটা এগোতেই ডান দিকে গলি। দু দিকে সারি সারি টালির ঘর, বস্তি। নিজেদের বাড়ি থেকে বড়রাস্তায় পড়বার এই একটিমাত্রই পথ রাজেশ্বরের। যখন অন্যমনস্ক থাকে, পথের দু দিকের এই শ্রীহীন বাড়িঘরগুলি চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখে যখন পড়ে মনটা কেমন করে ওঠে। তার যাতায়াতের পথে যারা পড়ে আছে, তাদের মধ্যে শিল্পপ্রীতির কোন লক্ষণ নেই। একই পাড়ায় বাস করেও রাজেশ্বরকে তারা চেনে না। মুখ চেনে, নামও জানে, রাজেশ্বর ছবি আঁকে এ-খবরও রাখে; কিন্তু তার বেশী আর-কিছু নয়। তার ছবি এরা দেখে না; দেখবার কোন আগ্রহই বোধ করে না। রাজেশ্বরের ছবি এমন দুরূহ আঙ্গিকের নয় যে, দেখে ওরা বুঝতে পারে না। দেখবার রুচি নেই, মন নেই, প্রবণতা নেই। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক্ত জনসাধারণের কাছে রাজেশ্বরের অস্তিত্বের কোন মানে নেই, তার কর্মকীর্তির কোন অর্থ নেই। যখন সচেতন থাকে এই চেতনা রাজেশ্বরকে বড় বেদনা দেয়। এমন সবল সুস্থ সুদৃঢ় দেহের অধিকারী হয়েও তার মন এক অসহায় নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। তার ছবি এদের জন্যে নয়, এরা তার জন্যে নয়। রাজেশ্বরের ছবিকে অনেকদিন—আরও অনেকদিন প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। এদের প্রশংসা পাবে বলে নয়, এরা তারিফ করবে বলে নয়, এমন কি টাকা দিয়ে কিনবে বলেও নয়, শুধু একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখবে বলে। এরা-যারা তার প্রতিবেশী এরা—যাদের সে যাতায়াতের পথে রোজ দেখতে পায়। এরা—যারা রাজেশ্বরকে রোজ দেখে অথচ কোনদিন তার ছবি দেখে না। এদের কাছে ছবি মানে সিনেমা। বিলোল কটাক্ষভরা লাস্যময়ী এক সিনেমা-অভিনেত্রীর ছবি পান-বিড়ির দোকানের ক্যালেণ্ডারে শোভা পাচ্ছে দেখে এল রাজেশ্বর। এবার তার হাসি পেল। সত্যি দোকানী তাকে চিনবে কী করে, তার দৃষ্টিকে বুঝবে কী করে? সেই শিক্ষা-দীক্ষা কি ওর আছে? ওর ওপর রাগ করা বৃথা। ওকে ঘুষি মারলে অন্যায় হত। ওর কাছে ছবির একটিমাত্রই অর্থ। যা বাসনার উদ্রেক করে, সম্ভোগ পিপাসাকে বাড়িয়ে দেয় ওর কাছে তাই শিল্প। ওর কাছে নারীর একটিমাত্রই মানে। সে শয্যাসঙ্গিনী। নারী যে ল্যাণ্ড-স্কেপেরও অংশ, সে যে লতার মত ফুলের মত, নদীর মত, ঝরনার মত—সেই সাদৃশ্য দোকানী কোত্থেকে খুঁজে পাবে যদি খুঁজতে তাকে শেখানো না হয়? রাজেশ্বর ওকে ঘুষি মারবে না, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তারপর আস্তে আস্তে ওর দোকান থেকে লাস্যময়ীর ছবিটি সরিয়ে এনে একটি সত্যিকারের ছবি ওখানে টাঙিয়ে দেবে।

"ও কী, ও রাজু, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ও রাজু?"

রাজেশ্বরের চমক ভাঙল। নিজেদের বাড়ি ছাড়িয়ে সে আরও উত্তরে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সোনা-মা না ডাকলে খেয়ালই হত না।

দু দিকে দুটি করে সবুজ সুপারিগাছ। তার মাঝখানে সাদা-রঙের দোতলা বাড়ি। মন্দাকিনী ডাকতে ডাকতে একেবারে পথে নেমে এসেছেন। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বেশ একটু মোটা হয়ে গিয়েছেন আজকাল। কিন্তু ওই যা দেখতেই মোটা। দিনরাত খাটুনি, ছুটোছুটির অন্ত নেই। অবশ্য মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা যার যার বউ নিয়ে কর্মস্থলে। কিন্তু জ্যেঠামশাই একাই একশ। তার জন্যে সোনা-মার একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

রাজেশ্বর বলল, "তোমার এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাপুজো হয়ে গেল সোনা-মা?"

মন্দাকিনী বললেন, "না, হবে কিসের। আমার সন্ধ্যাটা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে তোমার সুবিধে হয়, হতভাগা কোথাকার! পূর্ণের সঙ্গে বকবক করতে করতে সেই যে বেরিয়েছিস—আর ফেরবার নাম নেই। আমি ভাবলাম, তুই বুঝি তার সঙ্গে সেই মনোহরপুকুরেই চলে গেলি। বেলা বারোটা। এর পর কখন নাবি কখন খাবি বল্ ত।"

এ সব শাসনের কোন জবাব দিতে নেই। রাজেশ্বর স্মিতমুখে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। একবার জিজ্ঞাসা করল, "জ্যেঠামশাই খেয়েছেন?"

মন্দাকিনী বললেন "কখন। তাঁর এক ঘুম হয়ে এল বলে। ঘুম থেকে উঠে চা চাইবেন।"

রাজেশ্বর কোন কথা না বলে নাইতে গেল। বাথরুমে ঢুকে ঝপ ঝপ করে কয়েক মগ জল ঢেলে বাইরে এসে ভিজে কাপড়েই বলল "কই সোনা-মা ভাত-টাত কী আছে তাড়াতাড়ি দাও। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

মন্দাকিনী বললেন "তোমার আবার ক্ষিদে-তেষ্টা আছে নাকি বাপ?"

রাজেশ্বর হাসল। তেষ্টাকে কিছুতেই তৃষ্ণা বলবেন না সোনা-মা। অথচ তৃষ্ণা কথাটি কী সুন্দর। ধ্বনিমধুর। তৃষ্ণা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। যারা কবিতা লেখে তারা বোধ হয় এর সঙ্গে মিল দেবে কৃষ্ণা। শুকনো কাপড় পরতে পরতে হাসল রাজেশ্বর। আর হঠাৎ তার চোখের সামনে একখানা মুখ ভেসে উঠল। কৃষ্ণা না, গৌরী—গৌরাঙ্গী। সেই ল্যান্ডস্কেপের অবিচ্ছিন্ন অংশ। রাজেশ্বর নিজের হাতখানা চোখের সামনে রেখে কী যেন আড়াল করল।

মন্দাকিনী তা দেখে বললেন "ও আবার কী ভঙ্গি!"

রাজেশ্বর বলল, "একখানা ইনকমপ্লিট ছবি ঢেকে রাখলাম সোনা-মা।"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "পাগল হলি নাকি! আকাশে বাতাসে তুই কি সব জায়গায় ছবি দেখিস? মার কাছে গল্প শুনেছি তখনকার দিনে ছেলেদের নাকি পরীতে পেত। তোকে ছবিতে পেয়েছে।"

মেঝেয় আসন পেতে ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন মন্দাকিনী। মাছ-তরকারির বাটিগুলি চারদিকে সাজিয়ে দিলেন। ছোট একখানা থালা নিয়ে নিজেও বসলেন খেতে। একসঙ্গে না খেলে রাজেশ্বর বড় রাগ করে। খেতে খেতে গল্প করতে খুব ভালবাসে রাজেশ্বর। যত গল্প ওর খাওয়ার সময়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আজ ওর মুখে কথা নেই।

মন্দাকিনী বললেন, "কী রে, আজ বুঝি রান্না-টান্না কিছু ভাল হয়নি!"

রাজেশ্বর বলল, "কেন সোনা-মা, বেশ হয়েছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "অন্যদিন এক তরকারির সাতবার সুখ্যাতি করিস। চেয়ে চেয়ে খাস। আর আজ--"

রাজেশ্বর তাঁর দিকে না তাকিয়ে বলল, "একটা নতুন ছবির আইডিয়া মাথায় এসেছে সোনা-মা। তাই ভাবছি।"

একটু মিথ্যার আশ্রয় নিল রাজেশ্বর। নতুন ছবির ভাবনা এই মুহূর্তে সে ভাবছে না। একটি ভিন্ন রকমের দুশ্চিন্তা হঠাৎ তার মাথায় এসে ভর করেছে। মেয়েটিকে যদি সত্যিই শুধু এক নিসর্গ শোভা বলে ধরা যায়, তা হলে রাজেশ্বর অসত্য বলেনি। কিন্তু নিসর্গ সৌন্দর্য ছাড়াও যদি মেয়েটির মধ্যে অন্য কিছু থাকে, তা হলে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' হয়েছে। রাজেশ্বর ভাবতে লাগল, 'লতাপাতা নদী-ঝরনার দিকে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পার, কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন অপরিচিতা মেয়ের দিকে একপলক তাকানোই কঠিন। অপলক হয়ে থাকলে সভ্য জগৎ থেকে তোমাকে নির্বাসিত হতে হবে। তা ছাড়া লতা আর নদীর সঙ্গে নারীর একটা বড় রকমের প্রভেদ এই যে, তার নিজেরও দুটি চোখ আছে। তার প্রেম পুরুষকে কখনও কখনও অন্ধ করলেও নারী সব সময় চক্ষুষ্মতী। রাজেশ্বর যখন অতক্ষণ ধরে মেয়েটিকে দেখছিল সে রাজেশ্বরের সম্বন্ধে কী ভাবছিল কে জানে! তার চোখ দুটি যে সুন্দর তা রাজেশ্বর দেখেছে, কৃষ্ণকলি না হয়েও সে হরিণাক্ষী। কিন্তু সেই মৃগনয়নার দৃষ্টি ত ভাল করে দেখেনি। রাজেশ্বর তার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই সেই দৃষ্টিতে অনুরাগ না বিরাগ, সমর্থন না বিতৃষ্ণা কিছুই বোঝা যায়নি। ছি-ছি-ছি, মেয়েটি যদি তাকে বিড়ি-ওয়ালার সগোত্র বলে ভেবে থাকে তা হলে কী হবে, তা হলে যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না রাজেশ্বর। ফের যদি ওর সঙ্গে কোনদিন মুখোমুখি চোখাচোখি হয়, সে যে লজ্জায় মরে যাবে।'

জল খেতে গিয়ে বিষম খেল রাজেশ্বর।

মন্দাকিনী ধমকে উঠলেন, "কী যে তোর খাওয়ার ছিরি। সব সময় অন্যমনস্ক।"

ডান দিকের বড় শোয়ার ঘরখানা থেকে সর্বেশ্বরের নাকডাকার শব্দ আসছে।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রাজেশ্বর নিজের মনেই হাসল। বেশ আছেন জেঠামশাই। কাস্টমস অফিস থেকে রিটায়ার করবার পর দুপুরের ঘুমটি বেঁধে নিয়েছেন। একেবারে ছক-মেলানো জীবন। সকালে গীতাপাঠ, সাতটায় সংবাদপত্র, দুপুরে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তে পড়তে দিবানিদ্রা, বিকাল থেকে রাত দশটা কি এগারটা পর্যন্ত পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে অশ্ব-গজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফাঁকে ফাঁকে দু-এক পশলা দাম্পত্যকলহ। জীবনের একটি চমৎকার প্যাটার্ন, একটি নিখুঁত ফর্ম। ওঁকে লতার দিকে তাকাতে হয় না, নদীর দিকে তাকাতে হয় না, নারীর দিকেও তাকাতে হয় না। অমন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব বার্ধক্য কবে আসবে রাজেশ্বরের যেদিন লক্ষ শৈবলিনী চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভালবাসা ত দূরের কথা, চেয়ে দেখতেও ইচ্ছা করবে না!

মনে মনে হাসল রাজেশ্বর। হাসতে হাসতে নিজের ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনেক দিন পরে ফের একটি অয়েলের কাজ শুরু করেছে রাজেশ্বর। ক্যানভাস নিতান্ত ছোট নয়। রাস্তার কলে বস্তির কয়েকটি মেয়ে জল নিতে এসেছে। তাদের কেউ কুমারী, কেউ বা বধূ। উলঙ্গ ছেলে এসেছে পিছনে পিছনে। কাছেই ছোট বাজার। সওদা করতে করতে ক্রেতাদের কেউ কেউ পিছন ফিরে তাকিয়েছে, বিক্রেতাও অন্যমনস্ক। দূরে পপলারের সারির আড়ালে সৌধমালার আভাস দেখা যাচ্ছে। সবে ড্রয়িংটা শেষ হয়েছে, এখনও কিছুই হয়নি। পূর্ণ শাসিয়ে গিয়েছে, 'দেখো যেন প্রচারগন্ধী না হয়। শিল্পীর তুলি জীবনের রহস্যকে প্রকাশ করবে, কোন মতবাদকে আমল দেবে না।' কোন মতবাদের ভক্ত নয় রাজেশ্বর। কিন্তু দারিদ্র্য বঞ্চনা অশিক্ষায় মনুষ্যত্বের এই তিলে তিলে ক্ষয়, এই তাল তাল অপচয় তাকে মাঝে মাঝে বড় পীড়া দেয়। সূর্যাস্তের আভায় আকাশের বর্ণাঢ্যতা যখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যার আঁধারে ঢেকে যায়, দোতলার জানলা থেকে আরও একটি অন্ধকার জীবনযাত্রার দিকে রাজেশ্বরের চোখ কোন-কোনদিন নেমে আসে। চোখের সেই বিমূঢ় বিস্ময়ই তুলির ধূসর রঙে তার কোন কোন ছবিতে রূপ নেয়। এর চেয়ে বেশী কোন কথা জানে না রাজেশ্বর। জানবার চেষ্টাও তার নেই।

দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রাত বারোটা পর্যন্ত চমৎকার কেটে গেল। এর

মধ্যে শুধু বারকয়েক উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজেশ্বর। নিজের তুলি থামিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছে গাছের পাতার রঙ-বদলানো। আর সোনা-মার ডাকাডাকিতে নীচে গিয়ে একবার খেয়ে এসেছে। কাজ আর কাজ। নিজের পছন্দমত কাজে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। পূর্ণ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'শুধু শ্রমের স্বেদের মর্মই জানলে, কিন্তু আরও যে দু-এক রকমের ঘাম আছে তার মর্ম টের পেলে না।'

রাজেশ্বর প্রথমে বুঝতে পারেনি।

পূর্ণ তখন হেসে নিচু গলায় বলেছিল, 'রতিস্বেদ বলে একটা শব্দ আছে শুনেছ? তার অর্থভেদ করা অবশ্য তোমার কাছে শক্ত।' রাজেশ্বর সেকেলে গোঁড়া নয় যে, কানে আঙুল দেবে। হেসেই জবাব দিয়েছে, 'শক্ত কেন হবে? তবে শুনেছি তার সঙ্গে খেদটাও জড়িয়ে থাকে।'

খেদ অবশ্য শ্রমের স্বেদ থেকেও বাদ যায় না। রাশ রাশ ছবি ঘরে পড়ে থাকে। বিক্রি হয় না, তার জন্য দুঃখ আছে; এতদিন ধরে এত কষ্ট করে আঁকা ছবি হয়ত কোন দর্শক এসে এক কথায় নাকচ করে দেন, হয়ত ড্রয়িংএর তিনি কিছুই বোঝেন না, রঙ সম্বন্ধে তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই--এমন সমালোচকের কলমের খোঁচাও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও দুঃসহ নিজের অতৃপ্তি। আজ যে ছবি এঁকে আত্মপ্রসাদের অন্ত নেই, দুদিন বাদে সেই ছবিই নিজের সহস্র দুর্বলতার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। ব্যর্থতায় নৈরাশ্যে মন অবসন্ন হয়ে থাকে। আর্টিস্টের কাছে আত্মধিক্কারের চেয়ে বড় ধিক্কার আর নেই। নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সঙ্গে গগনস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার পদে পদে আপসের মত দ্বিতীয় বিড়ম্বনা আর কী আছে?

খেদ শিল্পীর বৃত্তিতেও রয়েছে। রঙ আর তুলির মধ্যে মিশে আছে সেই বিষাদ। তবু তার স্বাদ অনন্য। তাই নিজের অখণ্ড জীবন তার জন্য উৎসর্গ করে রেখেছে রাজেশ্বর। আর-কাউকে ভাগ দেয়নি—আর কারও দাবি মিটাতে যায়নি। সংসার নয়, পরিবার নয়, ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়, ব্যাপক বন্ধুসমাজ নয়, নারীসঙ্গ নয়। নেতি নেতি করে যে ব্রহ্মকে সে জানবার চেষ্টা করে চলেছে, সে তার শিল্প। তাকে সে সুলভ পণ্য করে তোলেনি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সে অন্যের নয়নসুখকর করেনি। তাতে অর্থের ক্ষতি হয়েছে, যশের ব্যাপ্তি হয়নি। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে অটল রয়েছে রাজেশ্বর। তার দরকার ত বেশী নয়। জ্যেঠামশাইকে তাঁর দুই ছেলে মাসোহারা পাঠায়। তাঁর নিজের পেনশনের টাকাও আছে। রাজেশ্বরের কাছ থেকে টাকা তিনি কিছুতেই নিতে চান না। বলেন, 'ও-টাকা দিয়ে তুই রঙ কিনিস, ও-টাকা আমাকে দিতে হবে না।'

তারপর থেকে জ্যেঠামশাইকে কিছু আর দিতে যায় না রাজেশ্বর। কিন্তু সোনা-মার হাতে কিছু কিছু ধরে দেয়। পোশাকের জন্যেও বেশী ভাবনা নেই রাজেশ্বরের। দুখানা ধুতি, দুটি খদ্দরের পাঞ্জাবি আর দুটি পা-জামাতেই পাঁচটি ঋতু কাটে। শীত কলকাতায় সংক্ষিপ্ত। তীব্রতাও কম। পোশাক পরিচ্ছদ মন্দাকিনীই জোগান। বোনদের কাছ থেকেও কিছু কিছু উপহার আসে।

এই কৃচ্ছ্রতার সার্থকতা কী—কোন কোন অন্ধকারঘন রাত্রে মনের কোণে প্রশ্নটা এখনও উঁকি দেয় রাজেশ্বরের। 'এই আমার স্বভাব' এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঙ্গত জবাব সে নিজেও দিতে পারে না। চেষ্টাও করে না। যেমন দিতে পারে না 'বিয়ে করলে না কেন' কোন কৌতূহলী বন্ধুর কি অনুরাগীর এই প্রশ্নের জবাব। সে জবাব একদিন হয়ত ছিল। আজ অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। আজকাল জ্যেঠামশাই কি সোনা-মাও বিয়ের কথা উল্লেখ করেন না। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তাগিদ দিয়ে আর কোন লাভ নেই।

পূর্ণ মাঝে মাঝে এখনও ঠাট্টা করে বলে, 'বাংলা দেশে পুরুষের পক্ষে যে কাজটা সবচেয়ে সোজা তুমি তাকেই এমন কঠিন ভেবে বসলে। একমাত্র বিয়েটাই এখানে চোখ বুজে করা যায়।'

রাজেশ্বর হেসে বলে, 'তার পরের ফলটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। বিবাহিত বন্ধুদের দেখে দেখে এটুকু বুঝতে পেরেছি।'

পূর্ণ বলে, 'দেখে শেখায় কোন কাজ হয় না। ঠেকে শেখাটাই আসল শেখা। কিন্তু তাও কি বলা যায়? ঠেকতে ঠেকতে শুধু ঠেকাটাই অভ্যাস হয়, শেখা আর হয়ে ওঠে না।'

মেয়েদের সম্বন্ধে পূর্ণ বড় বেশী অভিজ্ঞতার অধিকারী। তার বান্ধবীর সংখ্যা প্রচুর। মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যায়। দাম্পত্যকলহ থামতে চায় না। সালিশী করবার জন্যে ছুটতে হয় রাজেশ্বরকে। বিয়ের এই ত পরিণাম। দুদিন বাদেই স্ত্রীর চেহারা রক্ষাকালীর মত হয়ে ওঠে। রক্ষাকবচের মাহাত্ম্য আর থাকে না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে এবার শুয়ে পড়ল রাজেশ্বর। এই স্টুডিওর মধ্যেই দেয়াল ঘেঁষে একখানা ছোট তক্তাপোশ পাতা আছে। ছবি আঁকতে আঁকতে ক্লান্তি এলে শুয়ে গড়িয়ে নেয়। তা ছাড়া অনেক সময় শুয়ে শুয়েও ছবি আঁকে রাজেশ্বর। উপুড় হয়ে বুকের তলায় বালিশ চেপে স্কেচ করে। মেঝেয় বসে বসে ছবি আঁকাই বেশী অভ্যাস রাজেশ্বরের। চারদিকে রঙের বাটিগুলি ছড়ানো থাকে, মাঝখানে রঙ্গরাজ।

পাশের ঘরখানাই আসলে শোবার ঘর। সিঙ্গল বেডের খাটে ভাল করে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সোনা-মা। ছোট টেবিলটার উপর কাঁচের গ্লাস ঢাকা মাটির জলের কুঁজো আছে। সে কুঁজো রাজেশ্বরের নিজের হাতে অলঙ্কৃত। শম্ভু রয়েছে, ছোকরা চাকর। তবু সোনা-মা নিজের হাতে এসব করবেন। শুতে যাবার আগে ওই মোটা শরীর নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে একবার করে তাগিদ দিয়ে যাবেন, 'রাজু, অনেক রাত হল বাবা. যা এবার ঘুমো গিয়ে।'

আজও এসেছিলেন। বাবা মা ছেলেবেলায় বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। জ্যেঠাইমার মধ্যে নিজের মাকে পেয়েছে রাজেশ্বর।

কিন্তু পাশের ঘরে ভাল বিছানা থাকা সত্ত্বেও আজ আর তার উঠে যেতে ইচ্ছা করল না। মাথার নীচে পুরনো আর্ট-জার্নালগুলো জড়ো করে বালিশ তৈরি করল। পাশের ঘরটা বড় নিঃসঙ্গ। কিন্তু এ-ঘরে তার সঙ্গী আর সঙ্গিনীর অভাব নেই। এই ঘরের চার দেয়াল তার স্থায়ী আর্ট গ্যালারি। শুধু নদী প্রান্তর পশু পক্ষী লতা পাতা নয়, তার হাতের আঁকা অনেক নরনারীও দেয়ালে দেয়ালে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছবিগুলি বদলায় রাজেশ্বর। উলটে-পালটে নতুন করে সাজিয়ে দেয়। কিছুদিন আগে একটি সাঁওতালী মেয়ের ছবি এঁকেছে রাজেশ্বর। পূর্ণ তার খুব প্রশংসা করেছে। বিশেষ করে দুটি চোখের। রাজেশ্বরের হাতে মেয়েদের চোখ নাকি সবচেয়ে ভাল ফোটে। বাস-স্টপে সেই মেয়েটির চোখও বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে! ঘুমবার আগে সংশয়ের খোঁচা লাগল রাজেশ্বরের মনে। মেয়েটি যদি ভুল বুঝে থাকে, সে ভুল ভাঙবার কি কোনও উপায় নেই?

পরদিন রাজেশ্বরের ঘুম ভাঙল দেরিতে। রাত বেশী জাগলে সে একটু বেলা করেই ওঠে। অনেকদিন ছবি নিয়ে কাজ করতে করতে রাত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কাল সেভাবে জাগেনি। এমনিতেই কিসের একটা অস্বস্তিতে ভাল ঘুম হয়নি কাল।

হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে জ্যেঠামশাইয়ের ঘরে কাগজের হেড-লাইন-গুলোতে চোখ বুলিয়ে ফের এসে বসল ছবি নিয়ে। কিন্তু মন বসল না। দু নম্বর তুলিটা সরিয়ে রাখল রাজেশ্বর। যখন কাজে মন এগোয় না, হাতটাও সে পিছিয়ে নেয়। এইটুকু স্বাধীনতা তার আছে। সে কারও দাস নয়। কারও ফরমায়েস সে খাটে না, এমন কি নিজেরও নয়। তার রঙ শুধু অনুরাগের রঙ। তার আনুগত্য শুধু তার শিল্পের কাছে। আর কারও কাছে নয়।

বাইরে দেয়ালঘড়িতে ঢঙ করে একটা শব্দ হল। পেরেকে ঝুলনো হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিল রাজেশ্বর। সাড়ে দশটা। আর-কিছু বলতে হল না। ঘড়ির কাঁটার মতই ঠিক যান্ত্রিকভাবে কয়েকটা কাজ করে গেল রাজেশ্বর। পাজামা ছেড়ে কাপড় পরল, পাঞ্জাবি পরল তারপর কিসের তাগিদে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

মন্দাকিনী একবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ও রাজু, কোথায় যাচ্ছিস? তোর কি দরকার বল্ না, আমি শম্ভুকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "শম্ভুকে দিয়ে সে কাজ হবে না সোনা-মা। আমি আসছি।"

তারপর জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। তাদের গলি থেকে বড় রাস্তার মোড় মিনিট পাঁচেকের বেশী নয়। রাজেশ্বরের আড়াই মিনিট লাগল।

একটা বাস স্টপ ছেড়ে পূবমুখে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। রাজেশ্বর ভাবল, যাঃ, চলে গেল। এই বাসে যদি গিয়ে থাকে তা হলে আর কোন আশা নেই।

হরিণাক্ষীর বদলে বিড়ির দোকানের মালিকের সঙ্গেই আজ প্রথম চোখাচোখি হল। হাসল দোকানী, তার দাঁতগুলি কালো, চোখ দুটি লালচে, গায়ের গেঞ্জিটি আধ-ময়লা, পরনের লুঙ্গিটি গাঢ় নীল।

দোকানী বলল, "এই যে বাবু, আজ কিছু নেবেন?"

রাজেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল "হ্যাঁ নেব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও ত।"

"কী সিগারেট দেব?"

"দাও যে কোন একটা। দিলেই হল।"

দোকানী হেসে বলল, "আপনি কি সিগারেট ধরেছেন নাকি বাবু?"

রাজেশ্বর বলল, "না, আমি ধরিনি। বন্ধুদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। আজও দু-একজনের আসবার কথা আছে।"

খুচরো পয়সা কত দিল গুনে দিল না রাজেশ্বর, তার বদলে যে বস্তুটা নিল তার দিকেও তাকিয়ে দেখল না।

রাজেশ্বর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, ওই ছবিটা কি তোমার খুব ভাল লাগে?"

দোকানী যেন লজ্জায় মরে গেল। মাথা কাত করে একটু জিভ কেটে বলল, "পাইকার দিয়েছে বাবু তাই নিলাম।"

রাজেশ্বর বলল, "আচ্ছা, যদি ওই ছবিটার বদলে আর-একটা ছবি তোমার দোকানে এনে টাঙিয়ে রাখি—বেশ ভাল ছবি—।"

দোকানী বলল, "এ-ছবিও বেশ ভাল বাবু। পাইকার আমার বন্ধু। তার হাতের দেওয়া জিনিস কি সরানো ভাল।"

তারপর একটু হেসে বলল, "আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে বাবু, আর-একটা ক্যালেণ্ডার বরং আপনাকে এনে দেব।"

কিছুকাল ধরে রাজেশ্বরের খেয়াল হয়েছে তাদের ছবিকে জনপ্রিয় না হোক জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করতে হলে চারদিকে সস্তায় ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু বছরে দুবার একবার আর্ট-এক্‌জিবিশনে সেই পরিচয় গড়ে উঠবে না। সেই এক্‌জিবিশনে কজন লোক যায়, কবার করে যায়? কজনই বা ছবি দেখবার জন্যে যায় সেখানে? যাওয়াটা ফ্যাশান বলেই যায় বেশীর ভাগ দর্শক। তারা ছবি দেখে না। পনের মিনিটের মধ্যে চার শ ছবির উপর চোখ বুলিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করে। এই দলের দর্শকই ত বেশী। কিন্তু ছবি দেখা কি অতই সহজ? এ কি ঘড়ি দেখা যে, নিমেষের মধ্যে সময়টা জেনে নেওয়া গেল? একখানা ছবি দেখতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শককে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শিল্পীর যত সময় লেগেছে প্রায় সেই সময় দিতে হয়। নানা সময়ে নানাভাবে দেখতে হয় ছবিকে। তবে ত দর্শন সম্পূর্ণ হয়। ছবি দেখবার সেই চোখের বড় অভাব এদেশে। সেই চোখ তৈরি করতে হবে। সাধারণের মধ্যে শিল্প-প্রীতির উদ্বোধন করা চাই। সেই উদ্বোধন শুধু সাম্বৎসরিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে চলবে না, ন্যাশনাল গ্যালারি প্রতিষ্ঠাতেও সম্ভব হবে না। তাদের ছবিকে ঘরে ঘরে, হোটেলে রেস্টুরেণ্টে দোকানে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে লোকে ভাল ছবি সম্বন্ধে সচেতন হয়। ক্যালেণ্ডারে নয়, সাবান তেলের বিজ্ঞাপনে নয়, বইয়ের মলাটে নয়, সত্যিকারের ছবির প্রচারের জন্য আরও কি ভাল কোন উপায় বার করা যায় না?

"বাবু, পান নেবেন একটা?" দোকানী হেসে বলল, "বেশ মিঠে পান বাবু।"

রাজেশ্বর বলল, "না না, পান আমি খাইনে। আচ্ছা, তোমার দোকান যদি আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিই, তোমার ওই ক্যালেন্ডার থাকুক, আরও দু-একটা ছোট ছোট ছবি যদি এনে টাঙিয়ে দিই—"

দোকানী হেসে বলল, "কেন অত কষ্ট করবেন বাবু? আমার দোকান কি সেইরকম দোকান? তেমন ভাগ্য কি করে এসেছি? আপনারা যদি এখানে এসে মাঝে মাঝে পানটা বিড়িটা খান, দু-একজন খদ্দেরকে চিনিয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়। ওই যে তিনি এসেছেন।"

শেষ কথাটা অস্ফুট স্বরে বলল দোকানী। কিন্তু রাজেশ্বরের বুকের মধ্যে

হাজার গুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হল। কার কথা বলছে দোকানী? অমন করে সামনের দিকে তাকিয়ে ও কী দেখছে? কী ব্যাপার হতে চলেছে রাজেশ্বর তা জানে। সে তা অনুভব করতে পারছে। তবু কিছুতেই সে মুখ ফিরাবে না, চোখ তুলে তাকাবে না ওদিকে। দোকানীর লালচে চোখ কী করে মুগ্ধতায় সুন্দর হয়ে উঠেছে সে শুধু তাই লক্ষ্য করবে।

এক মিনিট গেল, দু মিনিট গেল। তারপর রাজেশ্বর ঠিক যেন যন্ত্রের মত ওদিকে তাকাল। এমন এক যন্ত্র, যা যন্ত্রীর শাসন মানে না, যা নিজের ইচ্ছায় চলে। ততক্ষণে সে রাস্তা পার হয়ে এপারে এসেছে। পরনে আজ চাঁপারঙের শাড়ি, গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউস, হাতে নীলরঙের একটা একসার-সাইজ বুক।

রাজেশ্বর চোখ তুলে তাকাতেই তার মনে হল মেয়েটি মৃদু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরের বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। অপরিচিতার এই হাসির মানে কী! কত নারীর মুখে তুলির টানে কত হাসি ভরে দিয়েছে রাজেশ্বর, কত ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে, মোনালিসার হাসির অর্থ নিয়ে গবেষণা করেছে বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু আজ একটি তরুণীর আকস্মিক মৃদু হাসি তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। এ হাসি নিশ্চয়ই বলতে চাইছে, 'তোমাকে চিনেছি। তুমি কালও নির্লজ্জের মত আমার দিকে তাকিয়েছিলে। আজও না এসে পারনি। বিড়ির দোকানের সামনে যারা এসে দাঁড়ায়, জটলা করে, তুমি তাদেরই একজন।'

না, এই ভুল ওর ভাঙতে হবে। যেমন করেই হোক ওকে বোঝাতে হবে, ও যা ভেবেছে তা ঠিক নয়। রাজেশ্বর দুরন্ত সাহসে নাগরিক বিধি ভঙ্গ করে আরও দু পা এগিয়ে গেল। তারপর কম্পিত গলায় বলল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না। কাল আমি আপনাকে একটি চেনা মেয়ে ভেবে—"

মেয়েটি হেসে বলল "আমি আপনাকে চিনি।"

"চেনেন?"

ঝড়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ যেন এক শ্যামল সুন্দর কূল পেয়ে গিয়েছে রাজেশ্বর: "আমাকে চেনেন?"

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, "আপনাকে না চেনে কে? প্রথম আপনাকে দেখি গতবার একাডেমির একজিবিশনে। আপনার দুখানা ছবি ছিল, আপনিও ছিলেন। ভেবেছিলাম আলাপ করব। কিন্তু আপনি একজন বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বোধ হয় একখানা ছবির ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করেই আপনি ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হ্যাঙ্গিং কমিটির মেম্বার ছিলাম। তারই একটা ব্যাপারে—"

মেয়েটি বলল, "কালও ভাবলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু আপনি কাল অন্যমনস্ক ছিলেন। সাহস পেলাম না।"

রাজেশ্বর মনে মনে বলল, 'সাহস পেলে না! আজ কী অভয় তুমি আমাকে দিলে তা তুমি জান না।'

মেয়েটি হঠাৎ পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছেন? কোন একটা বাস আসবার নাম নেই। আজও বোধ হয় আমার এগারটায় ক্লাস করা হবে না।"

রাজেশ্বর বলল, "আপনার কি রোজ এগারটায় ক্লাস থাকে?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ। আমাকে আপনি বলবেন না। আপনার মুখে আপনি শুনতে বড় লজ্জা করে। তুমি বলবেন। আমার নাম সুনন্দা। বাড়িতে সবাই নন্দা বলে ডাকে।"

রাজেশ্বর একটু ইতস্তত করে বলল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সুনন্দা বলল, "ওই আমার বাস এসে গেছে।"

বাসে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সুনন্দা। জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকাল। রাজেশ্বরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ফের হাসল একটু। বাসটা চলে গেল।

নিশ্চিন্ত হল রাজেশ্বর। তৃপ্ত হল, মুগ্ধও হল। কাল যে ছিল অপরিচিতা, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আজ তার সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, প্রায় ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। দুর্বোধ্য হাসির চেয়ে বোধ্য পরিচিত হাসি অনেক ভাল। সে হাসির মধ্যে অনেক আশ্বাস, নির্ভরতা আর অভয় মিশে রয়েছে। দুর্বোধ্য ছবির চেয়ে বোধ্য সহজগ্রাহ্য ছবি অনেক ভাল। সমস্ত জটিলতা শিল্পীর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাক, তার রেখা যেন সরল হয়, সবল হয়, তার রঙ যেন পরিচিত ভাষায় কথা বলে। যে চোখের দেখা দেখবে, সেও যেন ছবি থেকে কিছুটা নিয়ে যেতে পারে, আবার যে অন্তরঙ্গ হতে চায়, গভীরে ডুবতে চায়, সেও যেন মাত্র হাঁটুজল দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে না আসে। মহৎ শিল্পীর মধ্যে এই দুই লক্ষণই দেখতে পেয়েছে রাজেশ্বর। শিল্পী নিজে পরিশ্রম করবেন, রূপকে প্রকাশের জন্যে প্রাণপণ করবেন, কিন্তু যিনি দর্শক তিনি অনায়াসে তা দেখবেন। মহাকাব্যও তাই। তা বাচ্যার্থে সহজ, ব্যঞ্জনার্থে নিগূঢ়। কিন্তু এখন বাচ্য আর ব্যঞ্জনা এক হয়ে যাচ্ছে। অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তুমি তাকে বলবে—অনধিকারী, সে তোমাকে বলবে অপটু। পূর্ণ রাগ করে বলে, "তবে কি আমরা সবাই মিলে পটুয়া হব? আমাদের কি বক্তব্য বদলাবে না, প্রতীক বদলাবে না, পদ্ধতি বদলাবে

না? সেই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে যে তাল রেখে না চলতে পারবে সেই গজেন্দ্রগামিনীকে ত আর কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়তে পারব না? সে গরুর গাড়িতে ধীরে সুস্থে আসুক।"

পূর্ণের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। তবু রাজেশ্বরের মনে হয় তার কথাই একমাত্র কথা নয়, শেষ কথা ত নয়ই। আসলে যার যার তুলি তার তার হাতে হাতে। দক্ষতা, সিদ্ধির চেয়ে বড় ভাষ্য আর নেই।

রাজেশ্বর চলে আসছিল, দোকানী হঠাৎ ডাকল, "বাবু, আর-কিছু নেবেন না?"

"সিগারেট ত নিলাম।"

দোকানী হাসল ঃ "আমি ভাবলাম, আর-কিছু যদি আপনার দরকার হয়। আর এক প্যাকেট সিগারেট যদি নেন। একটা পান নিলেও পারতেন বাবু। খুব মিঠে পান।"

কালো কালো দাঁতগুলো আবার বের করল দোকানী। কী দুঃসাহস! রাজেশ্বরের সঙ্গে পরিহাস! তার দৈত্যের মত চেহারা দেখেও একটু ভয় হয় না ওর।

কিন্তু পরক্ষণেই রাজেশ্বর হাসল। ওর ওপর রাগ করা বৃথা। হেরে গিয়ে দোকানীর ঈর্ষা বেড়ে গিয়েছে। সান্ত্বনাই ওর প্রাপ্য। রাজেশ্বর মনে মনে বলল, 'কেন, লাস্যময়ীতে মন ভরল না তোমার? তুমি তাকে নিয়ে থাক। আমি আমার লাবণ্যময়ীকে পেয়েছি।'

রাজেশ্বর দোকানীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে মৃদু হেসে বলল, "আচ্ছা, তোমার পান এসে আর-একদিন খাব। আজ যাই।"

সারাদিন বেশ ভাল কাটল রাজেশ্বরের। রঙের বাটিগুলি তুলে নিয়ে উঁচু টুলটার উপর রাখল। নিজের কাজ দেখে নিজেই খুশী হল। তুলি চালাতে চালাতে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে লাগল রাজেশ্বর, 'মায়াবন বিহারিণী।'

চমৎকার মুড এসেছে।

বিকেল বেলায় মন্দাকিনী এসে দাঁড়ালেন ঃ "রাজু, খাবার-টাবার কিছু খাবিনে?"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "খাব সোনা-মা। এখানেই পাঠিয়ে দাও।"

মন্দাকিনী তবু গেলেন না। মুখ টিপে হেসে বললেন, "রাজু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "বল না।"

মন্দাকিনী বললেন, "লুকিয়ে লুকিয়ে এই বয়সে ও-সব কী করা হচ্ছে শুনি?"

সোনা-মার মুখে হাসি। কিন্তু রাজেশ্বরের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, বুক দুরু-দুরু।

"কী সোনা-মা?"

মন্দাকিনী বললেন, "খুচরো পয়সার জন্যে তোর পকেটে হাত দিতে গিয়ে দেখি কী, ওমা, এক প্যাকেট সিগারেট। এসব আবার কবে থেকে ধরলি?"

নিশ্চিন্ত রাজেশ্বর হো-হো করে হেসে উঠল, "ও, সেই কথা? পূর্ণের জন্যে কিনেছিলাম সোনা-মা। কেন, আমি বুঝি ওসব খেতে পারিনে?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "না বাপু, তোমার ওসব খেয়ে কাজ নেই। ওসব তোমার সইবে না। তোমার জন্যে দই চিঁড়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রাজেশ্বর স্মিতমুখে তাঁর দিকে তাকাল। পরনে সোনা-মার সাদা খোলের মিলের শাড়ি। কিন্তু পাড়ের রঙ টুকটুকে লাল। দুপাশের চুলের রঙ এরই মধ্যে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সিঁথির রঙ টুকটুকে লাল। ষাট পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সোনা-মার। কিন্তু দাঁতগুলি আশ্চর্য, আজও অটুট রয়েছে। লোকে ভাবে বুঝি বাঁধানো। তা নয়। এখনও পরিষ্কার ধবধবে সাদা সুগঠিত দাঁত, আর পাতলা ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। শুধু পানের রসে নয়, ওঁর গায়ের রঙও প্রথম যৌবনে দুধে-আলতায় ছিল। সেই আলতার আমেজ এখনও যায়নি। এত রঙ কি রাজেশ্বর প্রথম ওঁর কাছ থেকেই চেয়েছিল? ওঁকে দেখেই চিনেছিল? এই মাতৃমূর্তি রাজেশ্বর যে কতবার কত রকম করে এঁকেছে তার ঠিক নেই। পৌরাণিক আধুনিক কত মুখের সঙ্গে মিশিয়েছে ওই মুখের আদল তার হিসেব সে নিজেই জানে না। কখনও পার্বতীর কোলে গণেশকে দিয়েছে, কখনও যশোদার কোলে কৃষ্ণকে। সব মা-ই সোনা-মা। সব মাতৃরূপই এই রূপময়ীর।

মন্দাকিনী বললেন, "কিছু বলবি রাজু?"

রাজেশ্বর বলল, "না, ইয়ে, হ্যাঁ। শিবু আর বীরুর চিঠি পেয়েছ?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "এই ত সেদিন এল। ওরা ত লেখে না, বউমারাই ওদের হয়ে লিখে দেয়। আজকাল বউরাই হয়েছে ছেলেদের প্রাইভেট সেক্রেটারি।"

মৃদু হাসলেন মন্দাকিনী।

রাজেশ্বরও হাসল। সেই শিবু আর বীরু—শিবেশ্বর রায় আর বীরেশ্বর রায়। দুজনেই কৃতী, নামজাদা। একজন খড়্গপুরে জিয়োলজির প্রফেসর,

আর-একজন বোকারোয় ইঞ্জিনীয়ার। ওরা রাজেশ্বরের চেয়ে বয়সে ছোট—অনেক ছোট। কিন্তু দুজনেই পুত্র কলত্র নিয়ে পুরো গৃহস্থ।

রাজেশ্বর বলল, "রত্না আর চন্দাকে এ মাসে আনলে না সোনা-মা?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "সব মাসে কি আর আসতে পারে বাপু? কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সব অস্থির। কোনটার সর্দি, কোনটার কাশি। কেন, তুইও ত গিয়ে ওদের দেখে আসতে পারিস। শিবু-বীরুরাই না হয় দূরে থাকে। ভবানীপুর বালিগঞ্জ ত আর দূরে নয়। কিন্তু তুই কি আর তোর কোটর ছেড়ে নড়বি?"

আর-একটু দাঁড়িয়ে থেকে মন্দাকিনী চলে গেলেন। সত্যিই জ্যেঠতুতো বোন দুজনকে অনেকদিন দেখতে যাওয়া হয় না।

রাজেশ্বর ক্যানভাসে উলঙ্গ ছেলের কটিতে একটি লাল তাগা পরিয়ে দিল।

'কাচ্চাবাচ্চা।' রাজেশ্বর মনে মনে হাসল, 'কাচ্চাবাচ্চা।' হ্যাঁ, শিশুর ছবিও অনেক এঁকেছে রাজেশ্বর। অনেক। কিন্তু তাদের কণ্ঠে কি কাকলি ভরে দিতে পেরেছে? নিজে শুনেছে সেই কাকলি? ছবির শিশুর কাকলি কি কানে শোনা যায়? না—না—না। হাসিও শোনা যায় না, কান্নাও শোনা যায় না। কূজনও শোনা যায় না, গুঞ্জনও শোনা যায় না। কানের ভিতর দিয়ে নয় তার ছবি দুটি দৃষ্টির মাধ্যমে মরমে প্রবেশ করতে চায়। স্পর্শ করতে চায়, স্পর্শ পেতে চায়।

আজও অনেক রাত অবধি জেগে কাজ করল রাজেশ্বর। পরদিনও সকালে তুলি চলল। কিন্তু সাড়ে দশটায় এসে আবার একটি ঢং করে শব্দ। তুলি থামল। আশ্চর্য, ঘড়ি ত এমন আধঘণ্টা অন্তর অন্তরই বাজে। সব বাজনা কানেও যায় না। কিন্তু সাড়ে দশটার এই একটি মাত্র শব্দ যেন সেতারের সাতটি তারে ঝঙ্কার তুলেছে। আর তার পরই হৃদ্‌কম্প। রাজেশ্বর পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু গেল না। রিস্ট ওয়াচের কাঁটাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু ঘণ্টা শ্লো করে দিল। সাদা দেয়ালে নিজের কালো অনাবৃত পিঠটাকে চেপে ধরল শক্ত করে। 'না রাজেশ্বর, আজ তুমি যেতে পারবে না। আজ তোমার যাওয়ার একটি মাত্রই অর্থ হবে। দোকানী তার কালো দাঁতগুলো থেকে আবার হাসবে। আশেপাশের খদ্দের-বন্ধুরা যারা তোমাকে দু'দিন ধরে লক্ষ্য করছে তারা চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করবে। আর ভাগ্যক্রমে সেই কুন্দ-দন্তীর দেখা পেয়েও তার হাসি দেখতে পাবে না, দৃষ্টির প্রসন্নতা দেখতে পাবে না। এই তৃতীয় দিনেও তোমাকে একই সময় একই জায়গায় একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সে লজ্জিত হবে, বিরত হবে, বিস্মিত হবে।

কাল তুমি জিতে এসেছ, আজ গেলে হারবে। নিজের কাছে হারবে, তার কাছে হারবে। সবচেয়ে চরম হারা নিজের কাছে হারা। সবচেয়ে বড় ধিক্কার আত্মধিক্কার। তা ছাড়া গিয়ে তুমি আর কীই পাবে! যা পাবার তা ত তুমি পেয়েছ, যা নেবার তা ত তুমি নিয়েছ। আর তোমার মডেল দিয়ে কী দরকার! এখন মনোভূমিতে মর্মরমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা কর, আর কোন মূর্তির দিকে তাকিয়ো না।'

কঠিন আত্মশাসনে তৃতীয় দিন গেল, চতুর্থ দিন গেল, কিন্তু রাত্রি বুঝি আর কাটে না। এই দুদিন ধরে রাজেশ্বর শুধু শিক্ষক, সংস্কারক, নীতিবিদ্। কিন্তু শিল্পী নয়। দুদিন ধরে শুধু শাসন আর অনুশাসন চলছে, কিন্তু তুলি অচল। রঙের বাটি শুকনো। হঠাৎ রাজেশ্বর খাঁচায়-ভরা খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত গর্জন করে উঠল, 'না না না। আমি সমাজ চাই না, শিক্ষা চাই না, নীতি চাই না, আদর্শ চাই না। আমি শুধু আমার রঙের স্রোত চিরপ্রবাহিত রাখতে চাই। তার জন্যে মদের দরকার হলে মদ চাই; মাংসের দরকার হলে মাংস চাই।'

ঘরের দরজা বন্ধ, জানলা বন্ধ, রাজেশ্বরের মুখ বন্ধ। বনের বাঘ শুধু মনের মধ্যে গর্জন করতে লাগল। রঙের সমুদ্রে আজ রক্তের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম দিনে দশা আরও সঙিন দেখে খাঁচার বাঘকে রাজেশ্বর ছেড়ে দিল। কিন্তু যাবে যে, সবাই যে তাকে চিনে ফেলবে। 'আপনাকে না চেনে কে!' সে বলেছিল। কথাটায় আতিশয্য আছে। তার সংগে অলঙ্কার নেই, উক্তিতে অলঙ্কার। কিন্তু তার ঝঙ্কারও কি মধুর! সবাই চেনে না, কিন্তু পাড়ার অনেকেই ত তাকে চেনে। তার দেখা যে তারা দেখে ফেলবে। এমন কোন ছদ্মবেশ কি নেই; যার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে রাজেশ্বর? যাতে সে দেখবে অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না, চিনতে পারবে না?

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তক্তাপোশের তলায় খুঁজতে লাগল বস্তুটা। পাওয়া গেল একটা মুখোশ। পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের একবার মুখোশপরা অভিনয়ের আইডিয়াটা সে-ই দিয়েছিল। তাদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছিল কয়েকটা মুখোশ। চিহ্ন হিসাবে একটা পড়ে আছে। রাক্ষসরাজ রাবণের মুখোশটা। তারই হাতের আঁকা বড় বড় চোখ, নাক আর বিশাল গোঁফ। রাজেশ্বর নিজের মুখে এঁটে দিল সেই মুখোশটা। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হাসল। বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। আস্তে আস্তে রাজেশ্বর খসিয়ে নিল মুখোশটা।

হঠাৎ চোখে পড়ল পেরেকে-ঝোলানো তার রঙিন মনিপুরী থলিটি। যখন

বাইরে ছবি আঁকতে যায় এই থলিটি ঝুলিয়ে নেয় কাঁধে। ভরে নেয় স্থূল সূক্ষ্ম কতকগুলি তুলি, রঙের প্যাকেট, কাগজ, পেনসিল, স্কেচবুক। আজও তাই নিল। আজও যেন রাজেশ্বর ছবি আঁকতে যাচ্ছে। আজ আপন বেশটাই তার ছদ্মবেশ।

সেই রাস্তার মোড়। সেই সাড়ে দশটা। দশটা বেজে চল্লিশ হল। কিন্তু কই, তার যে দেখা নেই! দোকানীর চোখ এড়াবার জন্যে আজ রাজেশ্বর খানিকটা পূর্বদিকে সরে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকেও সব দেখা যায়। সেই পথ, সেই নবনগর, শুধু নাগরিকার দেখা নেই। এগারোটা বাজল, সাড়ে এগারোটা, বারোটা।

শেষ বৈশাখের কড়া রোদ ক্রমেই চড়ছে, ক্রমেই চড়ছে। চারদিকে আগুনের হলকা। সাড়ে বারোটা। ব্যাপার কী? আজ কি ওর ক্লাস আরও দেরিতে? নাকি আজ একেবারেই যাবে না?

বাসগুলো যাতায়াতের বিরাম নেই। যদিও লোকজন আজ কম। হয়ত বেলা-দুপুর বলেই চলাচল এমন বিরল হয়েছে।

ছাতা মাথায় এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন রাজেশ্বর তাঁকে ডেকে বলল "শুনুন।"

ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন, "কী ব্যাপার?"

রাজেশ্বর বলল, "আজ কি পর্বটর্ব আছে নাকি? আজ কি স্কুল কলেজ সব ছুটি?"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, "আজ রোববার।"

তারপর হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রাজেশ্বর আর-একবার নিজেকে ধিক্কার দিল। ছি-ছি-ছি! তার কি কোন খেয়ালই নেই। একেবারে কান্ডজ্ঞান হারিয়েছে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তার? দিন ঠিক নেই, তারিখ ঠিক নেই, হল কী? অবশ্য আগেও এমন অনেকবার হয়েছে। কোন কোন ছবি নিয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে। ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলানো হয়নি। মনেও সেই পরিবর্তনের কোন সাড়া জাগেনি। তার ত অফিস-আদালত নেই। বার-তারিখের হিসাব রাখবার তার দরকারই বা কী! দিন নয়, তারিখ নয়, শুধু আলো আর আঁধারের খেলা। আকাশে মাটিতে লতায় পাতায় ফুলে ফলে বিচিত্র বর্ণ সমারোহ। তার ইতিহাস ত মাস তারিখে চিহ্নিত নয়, নীলে লালে সবুজে পীতে বিভক্ত। তার জীবনপঞ্জীতে পুজো নেই পার্বণ নেই, শুধু রঙের উৎসব আছে। যেদিন উৎসব নেই, সেদিন অন্ধকার। কিন্তু

অন্তরের রঙের সমুদ্র যখন উদ্বেল হত, এই সসাগরা পৃথিবী তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেত, তার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ত না। কিন্তু আজ ত আর সে কৈফিয়ত নেই রাজেশ্বরের। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন তারিখের বিভ্রম তাকে দিন তারিখ ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই বিভ্রমও কী মধুর! কী বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রপাশে ঢাকা! সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্রে আবৃত। রাজেশ্বর সেই আবরণেই মুগ্ধ। সেই আবরণ উন্মোচন করবে কি, রাজেশ্বর সেই আবরণে আভরণ সংযোগ করে! তাকে নানা রঙে রাঙায়, লতায় পাতায় ফুলে অলঙ্কৃত করে। সোনা-মা আর রত্না-চন্দাদের ঘট কলসি, ধুনুচি আর বাকী নেই, সব রাজেশ্বরের রঙ আর রেখায় চিত্রিত। তার এই অভ্যাস আছে জেনে পাড়াপড়শী বন্ধুবান্ধব অনেকেই তার কাছে মাটির কি কাঠের পাত্রগুলি দিয়ে যায়। অবসর সময়ে রাজেশ্বর সেগুলি রঙিন করে। পারতপক্ষে সে কাউকে ক্ষুণ্ণ করে না। মনে মনে ভাবে, 'আমার এই ত কাজ, আমি এই জন্যেই ত এসেছি। আদিহীন অন্তহীন অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে আমি এক রঙিন বুদ্বুদ।' মাটির ঘটে রঙ লাগাতে লাগাতে রাজেশ্বর ভাবে, 'মৃন্ময়ী, তোমার রঙের শেষ নেই, রসের শেষ নেই, রূপের শেষ নেই। তবু তোমার এই গালে আর ঠোঁটে আমি আমার তুলি বুলিয়ে গেলাম।'

কিন্তু আজ আর নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত নেই রাজেশ্বরের। আজ সে হেরে গিয়েছে। কী ভাগ্য তার এই হার আর কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু মনের আর-এক কোণ থেকে গুঞ্জন উঠল, 'যদি একজন দেখতে পেত, সে সৌভাগ্যের সীমা থাকত না।'

রাজেশ্বরকে দেখতে পেয়ে মন্দাকিনী খুব বকলেন, "ছি-ছি-ছি, দিনের পর দিন তুই কী হচ্ছিস বল্ ত। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। তুমি একটা সাংঘাতিক অসুখবিসুখ ঘটাবে আমি বলে দিলাম রাজু।"

বিকাল বেলায় দুটি ছেলে এল দেখা করতে। তপন আর জয়ন্ত। আর্ট কলেজে একটি থার্ড ইয়ারে আর একটি ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। দুজনেরই ফাইন আর্টস। দুজনেই চারুদর্শন। বয়স একুশ-বাইশের বেশী হবে না। জয়ন্ত আবার কচি কচি দাড়ি রেখেছে। রাজেশ্বর হেসে বলল, "এ যুগে কি দাড়ি চলবে?"

আজকালকার ছেলে মুখচোরা নয়। হেসে জবাব দিল "বলা যায় না। হয়ত এই সেঞ্চুরির লাস্ট ডিকেডে দাড়ি আবার ফিরে আসতে পারে। অনেকে বলেন এই বিংশ শতাব্দী ব্যারেন। অন্তত এই মধ্যভাগ। বোধ হয় একবিংশ ঊনবিংশের পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে।"

"দাড়ির জোরে নাকি?" হেসে উঠল রাজেশ্বর।

ওরা ঘুরে ঘুরে তার ছবি দেখল। টেম্পারা, ওয়াশ। ওয়াটার কালার অয়েল। নিজেদের মধ্যে পুরনো ছবির সঙ্গে নতুন ছবির তুলনামূলক সমালোচনা করল।

তপন বলল "আমাদের প্রফেসর ঘোষ আপনার কথা প্রায়ই বলেন।"

রাজেশ্বর বলল, "তাই নাকি?"

তপন বলল, "হ্যাঁ। তিনি বলেন এমন নিষ্ঠা নাকি আর দেখা যায় না। আর কোন আকর্ষণ নেই, ডাইভারশন নেই— ।"

রাজেশ্বর আস্তে আস্তে বলল, "নিষ্ঠা দিয়ে ত বিচার না, সিদ্ধি দিয়ে বিচার। তাই হল একমাত্র মাপকাঠি।"

তপন বলল, "কিন্তু নিষ্ঠা কি সিদ্ধির উপায় না? নিষ্ঠা ছাড়া কি কিছু হবার জো আছে।"

রাজেশ্বর যেন আত্মগতভাবে বলল, "নিষ্ঠা সিদ্ধির উপায় কিনা জানি না। তবে তাতে আত্মপ্রসাদ আছে। অন্য সব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এনে শুধু একটিমাত্র ফরমের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা। অন্য সব চিন্তা চেষ্টা ডেস্ট্রাবসন মাত্র। ছোট ক্যানভাস কিন্তু নিপুণ কাজ চাই।"

দিল্লীর একাডেমিতে রাজেশ্বরের ছবি গিয়েছে সেখান থেকে গিয়েছে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে। সে আলোচনা হল। দেশে ছবির বাজার কী করে প্রসারিত করা যায়, শিল্পীসঙ্ঘ গড়বার সার্থকতা কী কেন সেই সঙ্ঘ গড়ে উঠতে উঠতে বার বার ভেঙে যায় তাই নিয়ে আলোচনা চলল। সোনা মা চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হয়-হয়। ওরা দাঁড়াল। বিদায় নেওয়ার আগে দুজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

রাজেশ্বর বলল, "আহাহা ওসব আবার কী!"

কিন্তু মন ফের প্রসন্নতায় ভরে উঠল। এই প্রণাম তাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে। ঠিক এ সময় এই প্রণামের যেন বড় দরকার ছিল।

রাজেশ্বর ভাবল, 'আশ্চর্য, সেও ওদেরই বয়সী। কি ওদের চেয়েও দু-এক বছরের ছোট। উনিশের বেশী হবে না তার বয়স। তবু তাকে কেন এত ভয়? কেন তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, কেন উঁচু আসনে শুধু প্রণম্য হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না, কেন একেবারে সমতলে নেমে আসতে সাধ যায়।'

বস্তি চিত্রে আজ আর মন বসল না। ইজেলটা নীল পর্দায় ঢেকে রেখে নতুন একটি ল্যাণ্ডস্কেপ নিয়ে বসল রাজেশ্বর। ক্ষীণস্রোতা এক গ্রামের নদী। এক পারে দিগন্ত-ছোঁয়া সবুজ শস্যের ক্ষেত। আর-এক পারে শুধু একটি পথরেখা সরু আর সাদা।

এখন রঙ নয়, শুধু ড্রয়িং। শুধু পেনসিলের রেখা। কিন্তু পটের আগে মানসপট। সেখানে সবই ফুটে উঠেছে।

আজ একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল রাজেশ্বর। আজও স্টুডিয়োর ঘরেই বিছানা পাতল। নেটের মশারিটা টানিয়ে নিল নিজের হাতে। দু-একটা মশা সেদিন বড় উৎপাত করেছিল। সেইজন্যেই ঘুম হয়নি।

আজও ঘুম এল না। বারোটা, একটা, দুটো, আড়াইটা। ঘড়ির ঘণ্টা শুনতে লাগল রাজেশ্বর। আর হঠাৎ মনে হল তার মশারির পাশে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে আলো নেই, কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আর সেই জ্যোৎস্নায় নেটের মশারির ফাঁক দিয়ে তাকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। তার দিব্য রূপ ঘর আলো করেছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী তন্বী অসামান্য লাবণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ পর্যন্ত যত রূপময়ীকে দেখেছে রাজেশ্বর, যত রূপময়ীর ছবি এঁকেছে তাদের সব রূপ ওই এক দেহাধারে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। এই একই বরতনু ঘিরে তার সব সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি করে চলেছে। 'রাজেশ্বর, তুমি আমাদের চোখ দিয়েছ, মুখ দিয়েছ, নয়নে অধরে ক্ষুধা দিয়েছ, তৃষ্ণা দিয়েছ, কিন্তু সেই তৃষ্ণা মিটাবার উপায় ত বলে দাওনি। রাজেশ্বর প্রাণের বিপুল চাঞ্চল্যকে তুমি রেখা আর রঙের বাঁধনে বেঁধে রেখেছ। আজ আমরা সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি। একটি শিখা একটি বাসনার আকার নিয়েছি। রাজেশ্বর, আজ আমরা আহুতি চাই।'

রাজেশ্বর মশারি তুলে সাগ্রহে বলল, "এস, এস, এসেছ।"

কিন্তু কে আসবে? ঘরে কেউ নেই। মেঝেয় সেই কাগজপত্র, এক কোণে ইজেলটা, আর-একদিকে সেই রঙের বাটিগুলো ছড়ানো রয়েছে। দেয়ালের ছবিগুলি স্থির অকম্পিত। ফ্রেম আর কাচের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাজেশ্বর সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তাতে নতুন কিছু দেখা গেল না।

ছি-ছি-ছি। রাজেশ্বর কি পাগল হয়ে গেল!

সে কি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ? তা ত নয়। সে ত সম্পূর্ণ জেগেই ছিল। একটুও ঘুমায়নি। তবে কি এ দৃশ্য বাস্তব? না, তাও নয়। বাস্তবের চেয়েও যা বড়, বাস্তবের চেয়েও যা বেশী শক্তিশালী এ সেই কল্পনা। আঁধারের পটে মনের তুলি দিয়ে আঁকা এ সেই নিজেরই মানসী মূর্তি। ছায়ার চেয়েও ছায়া। তবু তাতে কী জীবনস্পন্দন, প্রাণের কী পরিপূর্ণতা!

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। রাজেশ্বর কি ভয় পেল? ভূতের ভয় নয়, পরীর ভয়? বাস্তবেও ভয়, কল্পনাতেও ভয়? কিন্তু শুধুই কি ভয়? সেই ভয়ের সঙ্গে আরও কিছু কি মিশে নেই?

কুঁজোটা এ ঘরে এনে রেখেছিল। ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল রাজেশ্বর। তারপর নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই হাসল। না, অত ভীত নয় রাজেশ্বর। অনেক বিপদে আপদে সে দেহের শক্তিকে প্রয়োগ করেছে, গুণ্ডার আক্রমণ রোধ করেছে, নিজেকে বাঁচিয়েছে, অন্যকেও। দেহের শক্তি দিয়ে এই দেহকে বেঁধে রাখবে।

পাগলা, মনটাকে তুই বাঁধ। মন নয়, দেহকে বেঁধে রাখো। দেহ নিয়েই ত যত বিপত্তি। মনকে ছেড়ে দাও। তাকে কেউ দেখতে পায় না, ধরতে পায় না, ছুঁতে পায় না। তুমি অদৃশ্য হতে চেয়েছিলে। দেহকে ঘরের মধ্যে ধরে রেখে মনকে যদি অভিসারে পাঠিয়ে দাও তা হলে আর ছদ্মবেশের দরকার হবে না।

ফের শুতে আসবার আগে রঙের বাটিগুলি একটু গুছিয়ে রাখল রাজেশ্বর। রঙ আর রঙ। তারই হাতে তৈরী সবুজে নীলে লালে বিচিত্র বর্ণের সংমিশ্রণ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রাজেশ্বর। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অনঙ্গ, এ কী রঙ্গ তোমার! আমি ত তোমাকে চাইনি। আমি ত তোমাকে বারবার এড়িয়ে গেছি। আমি জানি তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তুমি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আর নাও ফিরতে পারি। কিংবা যদি বা ফিরি, এই ধ্যানের আসনে ফের হয়ত বসবার ক্ষমতা আর আমার থাকবে না। আমার অনেক বন্ধুকেই ত জানি। যারা ফিরে এসেছে তারাও অবশ বিকলাঙ্গ। তাদের হাতের তুলি কাঁপে। আঁচড়ে দৃঢ়তা নেই, ঋজুতা নেই। তাই তোমার শত প্রলোভনেও আমি তোমাকে আমল দিইনি। কিন্তু একী রঙ্গ তোমার অনঙ্গ! তুমি আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে আমার রঙের বাটির মধ্যে অঙ্গ ডুবিয়ে বসে আছ!'

মদনকে ভস্ম করল না রাজেশ্বর, তা শুধু মহেশ্বরই করেছিলেন, করে বুদ্ধিমানের কাজ করেননি। রাজেশ্বর শুধু উপহাস করল—মদন আর মহেশ্বর দুজনকেই। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ফের মশারির মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত কাজ করল। তারপর তার হঠাৎ মনে হল পূর্ণের একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। কেবল পূর্ণই আসে। সে ত বড়-একটা যায় না। একবার যাওয়া উচিত। কী ভেবে থলিটাও কাঁধে নিল রাজেশ্বর। ভরে নিল রঙের বাটিগুলো, তুলি আর কাগজ, আর স্কেচ বুকটা। পূর্ণ যদি না ছাড়ে তা হলে ওর ওখানেই আজ সারাদিন কাটাবে। বিকেলে ওর ঘরে বসে, কি বাইরে কোথাও এসে ছবি আঁকবে।

মন্দাকিনী রান্না করতে করতে উঠে এলেনঃ "আজ আবার কোথায় চললি রাজু?"

রাজেশ্বর বলল, "একটু পূর্ণর ওখানে যাচ্ছি সোনা-মা। এবেলা আর ফিরব না।"

"ও মা, আমি যে তোর জন্যে আজ চিতল মাছের পেটি আনালাম।"

রাজেশ্বর বলল, "ও-বেলা এসে খাব সোনা-মা। মাছের পেটি আমার পেটে ঠিকই যাবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তা যা বাপু, একটু ঘুরে-টুরে আয়। কদিন ধরে এমন মুখ করে আছিস, তাকানোই যায় না। আসবার সময় রত্নার খবর নিয়ে আসিস। ওর ছেলেটার সর্দিকাশি, মেয়েটার আবার কান পেকেছে।"

বারান্দার ইজিচেয়ারখানায় হেলান দিয়ে সর্বেশ্বর তখনও কাগজ পড়ছেন। রাজেশ্বরকে দেখে মুখ তুলে বললেন, "কী, বেরুনো হচ্ছে?"

"হ্যাঁ জ্যেঠামশাই।"

সর্বেশ্বর একটু হাসলেন। ভাইপোর বৃত্তি সম্বন্ধে সস্নেহ উৎসাহ দেখিয়েঃ "নতুন ছবি-টবি কি কিছু মাথায় এল?"

রাজেশ্বর একটু মাথা চুলকিয়ে হেসে বলল, "কই আর—!"

সর্বেশ্বর ভরসা দিয়ে বললেন, "আসবে আসবে। বসে বসে একটু ভেবে-টেবে নিস, তা হলেই আসবে। প্রতিভার একটা লক্ষণ হল নব নব উন্মেষ-শালিনী। নতুন চাই, নতুন চাই। আর এ যুগের যা হাওয়া তার চাই নিত্য-নতুন। হ্যাঁ, আর এক কথা। শোন, যেয়ো না। সেদিন এই কাগজেই তোমার সমালোচনা বেরিয়েছিল। তেমন ভাল লেখেনি। দেখে বড় দুঃখ হল। তোমার ওই শান্ত শিষ্ট মিঠে মিঠে ছবিতে আর চলবে না রাজু। যুগের হাওয়া বড় গরম। কড়া কড়া জিনিস নিয়ে এস। ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ এখন এই সব চাই। বিদ্রোহ বিপ্লব—খুব কড়া কড়া ব্যাপার। বুঝেছ?"

রাজেশ্বর একটু মাথা চুলকিয়ে হেসে বলল, "তাই হবে জ্যেঠামশাই।"

তারপর রাস্তায় নেমে পড়ল। তাকে এই উপদেশ শুধু জ্যেঠামশাই নন, আরও অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে যা সে তাই। তার তুলি ত অন্যের হুকুমে চলবে না। তা হলে থেমে পড়বে। তার স্বভাবের বাইরে ত আর যেতে পারে না। যারা সুখ্যাতি করেন তাঁরাও বলেন, "মিষ্টি, তোমার ছবি বড় মিষ্টি।" শুনে প্রসন্ন হয় না রাজেশ্বর। আজকাল যেমন ভাল মানুষ বললে পুরো মানুষ বোঝায় না, তেমনি লেখা কি ছবিকে শুধু মিষ্টি বললে তার আড়ালে কেমন একটু অনুকম্পা মিশানো থাকে। প্রসাদগুণ আজকাল আর বড় গুণ নয়। দর্শকের চোখ ছবি দেখতে এসে বার বার খোঁচা খাক, করকর

করুক, তাও যেন ভাল। রাজেশ্বর জানে সে অত মিষ্টি নয়। না স্বভাবে, না ছবিতে। তার মনের মধ্যে যে অকল্যাণের আর-এক পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে সে তার খবর রাখে। ছবির আলো-ছায়ার মত সেখানেও যে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে সে তা জানে। তবে প্রকাশের বাধা কিসের ? তার নির্দিষ্ট রূপ-বোধের? রুচি আর রীতির? তবু মাঝে মাঝে নিজেকে বদলাতে ইচ্ছা করে রাজেশ্বরের, সাধ হয় পুনর্জন্মের। সেই নবজন্ম কি চূড়ান্ত ডিসিপেশন-এর মধ্যে একবার ডুব দিয়ে না উঠলে আর সম্ভব নয়?

সেই বড় রাস্তার মোড়। তার ওপারে সেই সরু পথ. ছায়া-শীতল দীর্ঘিকা। এপারে রোদের তাপ ফের শুরু হয়েছে। হঠাৎ দুই পা যেন আটকে গেল রাজেশ্বরের। কর্ণের রথ বসে গিয়েছিল. তার পদরথ। নাকি কে যেন দুটি কাঁকন-পরা হাতে তার পদযুগল জড়িয়ে ধরেছে, 'যেয়ো না, যেয়ো না।'

রাজেশ্বরের বাস চলে গেল, কিন্তু সে যেতে পারল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কাল যার দেখা পায়নি, আজ সে এল। কাল যে রোদে পুড়িয়েছে, আজ সে দূর থেকেই হাসি আর সুধার বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে পাশে এসে দাঁড়াল।

সুনন্দা হেসে বলল "আপনাকে যে কদিন দেখিনি।"

রাজেশ্বর বলল, "আমাকে কি তুমি রোজ দেখবে বলে আশা করেছ ?"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, "না, তা ঠিক নয়, তবে আপনি ত এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। তাই বলছিলাম। আপনাকে বাসে করে যেতে আমি আরও অনেকদিন দেখেছি।"

রাজেশ্বর বলল "তাই নাকি? কই আমি ত দেখিনি।"

সুনন্দা বলল, "বাঃ. আপনারা কেন দেখবেন!"

রাজেশ্বর বলল, "তা ঠিক। আমাদের না দেখাই উচিত।"

সুনন্দা বলল, "আপনি বুঝি খুব উচিত-অনুচিত মানেন? শুনেছি আর্টিস্টরা নাকি মানেন না?"

রাজেশ্বর মেয়েটির এই প্রগল্‌ভতায় খুশী হল। তার ধারণা হল, ওর বয়স কম হলেও, মন পরিণত, জীবন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

রাজেশ্বর বলল, "কেউ কেউ মানেন, কেউ কেউ মানেন না। কেউ বা শিল্পে মানেন, জীবনে মানেন না। কেউ বা উল্টো।"

সুনন্দা বলল, "ওই যে আমার বাস এসে পড়েছে। আপনি কোথায় যাবেন?"

রাজেশ্বর বলল, "দমদমের দিকে।"

সুনন্দা খুশী হয়ে বলল, "তা হলে ত ভালই হল। আমরা একসঙ্গে যেতে পারব।"

রাজেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, তা পারব।"

ঈর্ষাকাতর দোকানীর চোখের উপর দিয়ে রাজেশ্বর সুনন্দার সঙ্গে বাসে উঠল। একই সীটে বসল পাশাপাশি। জানলার ধারে সুনন্দা, সুনন্দার ধারে সে। বাস যশোর রোড ধরে এগোতে লাগল।

এই রাস্তা দিয়ে রাজেশ্বর জীবনে কতবার যে যাতায়াত করেছে তার ঠিক নেই। কখনও পূর্ণকে নিয়ে, কখনও অন্য বন্ধুর সঙ্গে, কখনও একা। কখনও বাসে, কখনও ট্যাকসিতে, কখনও হেঁটে। ছবি আঁকতেও এসেছে, পথের ধারে গাছের তলায় বসে স্কেচ করেছে, অখ্যাত চায়ের দোকানে পিছনের বেঞ্চে বসেছে, এঁকে তুলেছে দোকানের মালিক আর খদ্দেরদের। কোনদিন বা নেমে গিয়েছে মাঠের মধ্যে কি পোড়ো কোন বাগান-বাড়িতে। চায়ের কাপকে করেছে রঙের বাটি, কি চীনামাটির প্লেটের চারদিকে থোকে থোকে রঙ রেখে নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু আজকের যাত্রা অন্য রকম, আজকের যাত্রা উদ্দেশ্য-হীন, একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা। সেই পরিচিত পথ, দোকান পাট, গাছপালা সব যেন আজ রঙ বদলেছে, রূপ বদলেছে। যেন এক অচিন দেশের কন্যাকে নিয়ে এক অচিন দেশে চলেছে রাজেশ্বর। সেখান থেকে যদি না ফেরে রাজেশ্বর, কোন ক্ষতি নেই। সেখানে এক নতুন জীবন, নতুন জন্মের স্বাদ পাবে রাজেশ্বর। সেখানে হয় ত তার আর কোন পরিচয়ই থাকবে না। এই খ্যাতি নয়, কীর্তি নয়, খ্যাতির স্পৃহা নয়, তা হারাবার আশঙ্কা নয়, শোক নয়, এই রাশ রাশ পুঞ্জীকৃত ছবির বোঝা নয়—কিছুই সে নিয়ে যাবে না। সেখানে সে শুধু একজনের সঙ্গী। তার আর কোন দ্বিতীয় পরিচয় নেই, পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনি কখন ছবি আঁকেন?"

এক ভিন্ন জগৎ থেকে রাজেশ্বর যেন ফিরে এলঃ "কী বলছ!"

"কখন ছবি আঁকেন আপনি?"

রাজেশ্বর বলল, "ও। তার কি কিছু ঠিক আছে? যখন ভাল লাগে তখনই আঁকি। সব সময়ই আমার সময়। আবার দিনের পর দিন যায়, যার কোন একটি মুহূর্তও আমার নিজের নয়।"

সুনন্দা বলল, "আপনার বুঝি সেই রকম হয়? কারও কারও আবার শুনেছি বাঁধা সময় থাকে। কেউ বা সকালে, কেউ বা বিকেলে, কেউ বা গভীর রাত্রে। আচ্ছা কী করে অত ছবি আঁকেন বলুন ত? আমি ত একখানাও আঁকতে পারিনে।"

রাজেশ্বর একটু হাসলঃ "তোমার পেরে কী দরকার? তুমি নিজেই ত একখানি ছবি।"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল।

তার সেই লজ্জা, তার সেই হাসি, তার সেই দুই গালের দুটি টোল মুগ্ধ চোখে উপভোগ করল রাজেশ্বর।

বাস চলতে লাগল। রাজেশ্বর ভাবল, চলুক। ওর যৌবন অনন্ত হোক, এই যাত্রা অনন্ত হোক, রাজেশ্বরের আর কোন কামনা নেই।

একটু বাদে সুনন্দা মুখ তুলে বলল, "আমার পিসীমাও তাই বলেন। তিনি বলেন আমি নাকি পটের বিবি। মোটেই তা নয়। আমি সংসারের অনেক কাজ করে দিয়ে তবে কলেজে বেরোই। তাই ত মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায়।"

রাজেশ্বর বলল, "তুমি বুঝি তোমার পিসীমার কাছে থাক?"

সুনন্দা বলল, "হ্যাঁ। বাবা ত নেই। মা আর আমি—"

রাজেশ্বর তাড়াতাড়ি করুণ কাহিনীর প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গেল। করুণ রসের ছবি এঁকেছে। আর নয়।

"তোমার কোন্ ইয়ার হল এবার?"

সুনন্দা বলল, "থার্ড ইয়ার।"

"আর্টস?"

সুনন্দা বলল, "হ্যাঁ।"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "থার্ড ইয়ার হল এ ইয়ার অব রোমান্স। আমাদের প্রফেসর সেন বলতেন।"

সুনন্দা আবার লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজেশ্বর ভাবল, কত অল্পসময়ের মধ্যে ও এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার ছবির সঙ্গে ওর পরিচয় আছে বলেই কি এই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে? আলাপের পটভূমি আগেই রচিত হয়ে রয়েছে। এখন শুধু তার ওপর রেখা আর রঙের কাহিনী।

এত অল্প সময়ের মধ্যে কারও সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে রাজেশ্বরও এর আগে পারেনি। আজ কী করে পারল? না পারবে কেন? এই কদিন ধরে এত কাছে কাছে রাজেশ্বরের আর কেই বা আছে? বাস্তবে কল্পনায় স্বপ্নে চিন্তায় দর্শনে অদর্শনে দিব্যদর্শনে এমন কাকে আর পেয়েছে রাজেশ্বর?

হঠাৎ সুনন্দা বলল, "আমাকে সামনের স্টপটায় নামতে হবে।"

রাজেশ্বর বলল, "সে কী! তোমার কলেজ ত আর দুটো স্টপ পরে।"

সুনন্দা সংকুচিত হয়ে বলল, "আমাকে এখানেই আগে একটু নামতে হবে। এগারোটায় আজ আর আমার ক্লাস নেই।"

রাজেশ্বর উল্লসিত হয়ে বলল, "তা হলে ত ভালই হল। চল, আমিও নেমে পড়ি। কোথাও বসে তোমার একটা স্কেচ করে নেব।"

সুনন্দা একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি নামবেন? আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আরও ওদিকে যাবেন!"

মেয়েটি ত বেশ চালাক। রাজেশ্বর বুঝতে পারল সে ওর সঙ্গে যায়, তা সুনন্দার ইচ্ছা নয়।

রাজেশ্বর হেসে বলল, "আমাকে তুমি আরও দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইছ? বেশ।"

হঠাৎ রাজেশ্বরের মনে একটা সংশয় উদগ্র হয়ে উঠলঃ "তুমি কি এখানে কারও সঙ্গে দেখা করবে?"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে ফের একটু চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ।"

তারপর রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে পরম নির্ভয়ে পরম বিশ্বাসের গোপনতম কথাটি প্রকাশ করে বলল, "হ্যাঁ। আপনি আর্টিস্ট, আপনি ত সব বোঝেন। ও আপনার খুব ভক্ত। আপনার নাম ওই আমার কাছে প্রথম করে, আপনার ছবি ওই আমাকে প্রথম চিনিয়ে দেয়। এর আগে ছবিতে আমার কোন ইনটারেস্টই ছিল না। ওর জন্যেই সব ওর জন্যেই। একদিন আপনার ওখানে নিয়ে যাব।"

রাজেশ্বর অস্ফুটস্বরে বলল, "বেশ ত।"

সুনন্দা বলল, "এই জন্যেই আপনাকে সব বললাম। আপনি আর্টিস্ট, আপনি সব বুঝবেন। আপনি যেন কাউকে আবার—"

রাজেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, "না না না।"

সুনন্দা একটু ইতস্তত করে বলল, "আজও অবশ্য আলাপ করিয়ে দেওয়া যায়। আপনার কাছে কোন লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। প্রথম দিন দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যেন আপন হয়ে গেছেন। তার আগে এত ছবি দেখেছি আপনার। ওদের বাড়িতেও আছে দু-একখানা। আপনি কি তা হলে নামবেন?"

রাজেশ্বর ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলল, "না না না।"

না না না। না না না। এরপর থেকে শুধু না না না। সুনন্দা নেমে গেল।

আরও কয়েকটা স্টপ এগিয়ে রাজেশ্বরও নামল। আজকের রোদ আরও কড়া, মেঘান্তরিত রোদের মত দুঃসহ। সেই তাপের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল রাজেশ্বর। বড় রাস্তা দিয়ে যাত্রিবোঝাই বাসগুলো

যাচ্ছে আসছে। কিন্তু কিছুই যেন চিনতে পারছে না রাজেশ্বর। সত্যিই সে এক অচিন দেশে এসে পড়েছে। কিন্তু কেউ আর কাছে নেই। সে এখন নিঃস্ব নিঃসঙ্গ। যে বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়ঝঞ্ঝার কথা জ্যেঠামশাই তখন বলেছিলেন তা সব যেন তার বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। সে বাসা বুঝি এখনই ভেঙে যায়। খড়কুটোর মত উড়ে যায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে এক পোড়া ইঁটের পাঁজার সামনে রাজেশ্বর নিজেকে আবিষ্কার করল। আশেপাশে ঊষর ধূসর পোড়োজমির বিস্তার। ইঁট-খোলায় ইঁট পুড়ছে। কতকগুলি ইঁট পুড়ে একেবারে ঝামা হয়ে গিয়েছে। অস্নাত অভুক্ত রাজেশ্বর সে দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

পশ্চিমের আকাশে সূর্য আস্তে আস্তে দিগন্তের দিকে নামছে। ও আবার কালই উঠবে।

কিন্তু রাজেশ্বর কি ফের উঠতে পারবে? এই পতন, এই লজ্জা, এই পরম পরাভব থেকে সে কি আর ফের উঠে দাঁড়াতে পারবে? রাজেশ্বর নিজের কাছে কোন জবাব পেল না।

তারপর আস্তে আস্তে যেন অভ্যাসবশেই থলিটা কাঁধ থেকে নামাল। হাতড়ে হাতড়ে বের করল স্কেচবুক আর পেনসিলটা। তারপর একটা সাদা পাতা খুলে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। এও বহুদিনের অভ্যাস। তা ছাড়া আর-কিছু নয়। প্রথমে অর্থহীন বাঁকাচোরা রেখার জঞ্জাল। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই রাজেশ্বর বিস্মিত হয়ে দেখতে পেল দুর্বোধ্য রেখাজালের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে একটি মুখ ফুটে বেরুচ্ছে। এখনও শুধু কুঁড়ি। কিন্তু কাল কি পরশুই একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ নেবে। রাজেশ্বর উল্লসিত হয়ে উঠল। একটি নতুন টেকনিকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। থলির মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেখল, রঙের বাটিগুলি ঠিকই আছে। স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে তার নিজের তুলিগুলির। কিন্তু এখন নয়, এখানে নয়। এখানে আর আলো নেই। আলোর জন্যে স্টুডিওতেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে শতদল আস্তে আস্তে তার পাপড়িগুলি মেলতে থাকবে। একটি কীট তার মধ্যে ছিল কি ছিল না তা তুচ্ছ হয়ে যাবে। এই কটি দিনের বেদনা গ্লানি আর পরাভব, শ্রান্তি আর অশ্রান্তি, তৃপ্তি আর তৃষ্ণা হয়ত একদিন তার নতুন ছবির উপকরণ হয়ে উঠবে, হয়ত ফের তার রঙের তরণী নানা আঘাটায় ঠোকর খেতে খেতে ঘূর্ণিস্রোতে পাক খেতে খেতে ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে সেই রূপলক্ষ্মীর ঘাটের দিকে যাত্রা করবে।

সন্ধ্যার আবছায়ায় রঙিন থলিটা কাঁধে নিয়ে ফের উঠে দাঁড়াল রাজেশ্বর। ছদ্মবেশ এতক্ষণে ফের তার আপন বেশ হয়েছে একমাত্র ভূষণ।

॥ চিত্রশালা ॥

ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার মোড়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম; হঠাৎ শুনতে পেলাম, 'এই যে কল্যাণবাবু! আসুন আসুন।'

সুরুচি স্টুডিয়োর মালিক শৈলেন সেহানবীশ আমাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করছেন, 'আসুন আসুন। একটু বসেই যান না। খুব তাড়া আছে নাকি? যাচ্ছেন কোথায়?'

গন্তব্য বিশেষ কোথাও ছিল না। বিনা কাজেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। শীতের দুপুর। শহরতলির বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে যে দোকানগুলি আছে তাদের কোন কোনটি একেবারেই রুদ্ধদ্বার। কোনটির দোর আধখানা খোলা কিন্তু দোকানে খদ্দেরের ভিড় নেই। এ অঞ্চলে দুপুর-বেলায় দোকানগুলির অবস্থা এই রকমই হয়। একটি মাত্র বড় রাস্তা। তাতে লোক-চলাচল কমে আসে। মাঝে মাঝে পনের বিশ মিনিটের ব্যবধানে এক একখানা করে বাস যায়। তারপর ফের স্তব্ধতা। যেদিন সময় পাই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দুপুরের এই জনবিরল শহরতলিকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। আজও তাই দেখছিলাম। শৈলেনবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেললেন। তিনি আমাদের পাড়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ পাড়ায় একাধিক লণ্ড্রি আছে, সেলুন আছে, ডিসপেনসারি রেস্টুরেণ্ট বইয়ের দোকান কোন কিছুই এককত্বের দাবি করতে পারে না। কিন্তু ফোটো তোলার স্টুডিও একটিই। ফলে শৈলেনবাবু বিনা প্রতিযোগিতায় এ পাড়ায় ব্যবসা করতে পারেন। এ পাড়ার অনেকের ফোটো তিনি তুলেছেন। জন্মদিনে শিশুর ফোটো, টোপর মাথায় দেওয়া বিয়ের বরকনের ফোটো, অন্তিম দশায় মুদিতনেত্র গৃহকর্তা কি কর্ত্রীর চারদিকে শোকাচ্ছন্ন ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী বাহিনী — সব রকমের ফোটোই ওঁর অ্যালবামে কি শো-কেসে পাওয়া যায়। সামনের শো-কেসে অবশ্য শৈলেনবাবু কারো মহাপ্রয়াণের ফোটো রাখেন না। সেখানে প্রাণবন্ত রূপবান রূপবতীদের ভিড়। যারা সুখী সুস্থ সুন্দর যৌবনে সমৃদ্ধ, স্টুডিয়োর বিজ্ঞাপন হিসাবে তাদের ছবিই শৈলেনবাবু টানিয়ে রাখেন। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ ফোটো তুলতে এসে। ওঁকে বাড়িতেও কয়েকবার ডেকে নিয়ে গিয়েছি। শৈলেনবাবু আমাদের কয়েকটি গ্রুপ ফোটো বেশ ভালোই তুলে দিয়েছেন। ভারি অমায়িক ভদ্রলোক। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। মুখে মিষ্টি হাসিটুকু লেগেই আছে। খদ্দের

যত দর-কষাকষিই করুক, ধৈর্য হারান না, বিরক্ত হন না, মেজাজ দেখান না। সৌজন্য শিষ্টাচার যে ব্যবসায়ের মূলধন শৈলেনবাবু তা ভালো করেই জানেন। বেশ মিশুক আর সামাজিক মানুষ। এ পাড়ায় শুধু ওঁর এই দোকানটুকুই আছে। বাসাটাসা নেই। সেসব বেলঘরিয়ায়। কিন্তু এখানকার অনেক গৃহস্থ বাসিন্দার চেয়েই ওঁর সামাজিক মর্যাদা বেশি। অনেক বাড়ির বিয়েতে অন্নপ্রাশনে উৎসবে অনুষ্ঠানে ওঁকে নিমন্ত্রিত হতে দেখেছি। তিনি এ পাড়ার শুধু একজন দোকানদার নন। আমার সঙ্গেও তাঁর আলাপ সাধারণ পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে এসেছে। সময় পেলে গল্প করবার জন্যে ওঁর কাউণ্টারের সামনে সরু টুলটিতে আমি বসি। সুখ দুঃখের কথা হয়। চায়ের দোকান খোলা থাকলে কাঁচের গ্লাসে করে চা আনান। পান, সিগারেট দিতে চান। কিন্তু আমার শুধু চা-ই চলে।

শৈলেনবাবু বলেন, 'আসবেন মাঝে মাঝে। এলে আপনার লাভ হবে।'

হেসে বলি, 'কি রকম?'

তিনি বলেন, 'এখানে কত লোক আসে। ছেলেরা আসে মেয়েরা আসে। জোয়ান বুড়ো নানা বয়সের নানা ধরনের মানুষ। আপনি তাদের দেখবেন আর গল্প লিখবেন।'

আমি বলি, 'দেখলেই বুঝি লেখা যায়? সে বরং আপনারা পারেন, দেখলেন আর ছবি তুললেন।'

শৈলেনবাবু হেসে বলেন, 'না মশাই তা নয়। আপনাদের ক্যামেরা আরো পাওয়ারফুল। একেবারে অন্তর্ভেদী। ফোটোতে আমরা কতটুকু তুলতে পারি। কিন্তু আপনারা ইচ্ছে করলে সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সমেত এক একটা গোটা মানুষকে তুলে ধরতে পারেন।'

মনে মনে ভাবি, ইচ্ছা করলেই পারিনে। সেই ইচ্ছার সঙ্গে অসামান্য শক্তির যোগ থাকা চাই। দুর্বল ক্যামেরায় আমরাও গাছপালা জীবজন্তু নারী-পুরুষের কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ধরে রাখি। তার অতল অন্তর-রহস্যের আভাসটুকু পর্যন্ত দিতে পারিনে।

শুনেছি ভদ্রলোক বি এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর কি কারণে পরীক্ষা আর দিয়ে উঠতে পারেননি। প্রথম দিকে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেছিলেন। সুবিধে হয়নি। অল্প বয়স থেকে ছবি তুলবার শখ ছিল। পরিণত বয়সে সেই শখই জীবিকা হয়ে উঠেছে। শৈলেনবাবু তাঁর সাধ্যের সীমা জানেন, তাঁর মাধ্যমের সীমাও জানেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই, অহঙ্কারও নেই। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে একটু নৈরাশ্যের স্পর্শ এসে লাগে। কিন্তু তাতে জ্বালা

নেই। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে নিশ্চিন্ত নিরিবিলিতে আলাপ করা যায়।

শৈলেনবাবু বললেন, 'আপনাকে আজ আর বোধহয় চা খাওয়ানো গেল না। দোকান টোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'না না চা থাক। এই অসময়ে আপনি চায়ের জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। বেলা বারোটা বাজল।'

আমি ঘড়িটা একটু দেখে বললাম, 'বারোটা দশ।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'হোলোই বা। আপনারা তো আর ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেন না। চললে আপনাদের কাজও হয় না। নিজেদের খেয়াল-খুশিমত আপনাদের চলাচল। বলতে গেলে এই দুটোই হল আপনাদের ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা। খেয়াল আর খুশি।'

শুধু আমি কেন আজকালকার দিনের কোন লেখকই যে অমন নিরঙ্কুশ নয়, সামাজিক ব্যাকরণের প্রত্যেকটি যত্ব ণত্ব সন্ধি সমাস তাঁকে মেনে চলতে হয়, সে কথা তুলে ভদ্রলোকের ধারণা বদলাবার আর চেষ্টা করলাম না।

শৈলেনবাবু ততক্ষণে তাঁর পকেট থেকে পয়সা বার করে ডাকাডাকি শুরু করেছেন, 'সুধীর, এই সুধীর, এদিকে এসো তো। এগিয়ো দেখো, মোড়ের দোকানটায় চা-টা আছে কিনা। পেলে নিয়ে এসো।'

সতের আঠের বছরের এই ছেলেটি শৈলেনবাবুর সহকারী। কাজ শেখে। তিনি যখন থাকেন না স্টুডিয়ো পাহারা দেয়। খদ্দেরদের ডেকে আদর আপ্যায়ন করে। সকাল সন্ধ্যায় দোকানে ধূপ ধুনো দেয়। আবার দরকার-মত চা পান-সিগারেটও আনে। সুধীর স্টুডিয়োর সামনেই দাঁড়িয়েছিল। কর্তার হুকুমে পয়সা নিয়ে চা আনতে চলে গেল।

শৈলেনবাবু বললেন, 'ওস্তাদ ছেলে। বসে বসে শুধু কথা গিলবে।'

কথা গিলছে বলেই কি শৈলেনবাবু ওকে চা আনবার ছলে বাইরে পাঠালেন? কিন্তু আমরা তো এমন কিছু আলোচনা করছিলাম না, যা ওর কানে গেলে মালিকের মর্যাদাহানি হত।

একটু বাদে আমি বললাম, 'তারপর আপনার খবর কি। দোকানপাট কেমন চলছে?'

শৈলেনবাবু একটু নৈরাশ্যের সুরে বললেন, 'কই আর চলে। এ যেন জাল পেতে বসে থাকা। মাছটাছ যদি কিছু পড়ল তো ভালো। না পড়লেও পেতে রাখতে হয়, দোকানের দরজা খুলে রাখতে হয়। যদি কেউ আসে। মাঝে মাঝে বড় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় জানেন?'

হেসে বললাম, 'কোন ব্যবসায়ীকে এ পর্যন্ত বলতে শুনিনি তাঁর কারবার

বেশ ভালোই চলছে। মুনাফার অঙ্ক যতই বাড়ুক মুখে তিনি সব সময় বলেন, না মশাই কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'আমাকে কি তেমন পাকা ব্যবসায়ী বলে আপনার মনে হয়? তেমন ব্যবসাদার হতে পারলে তো কথাই ছিল না কল্যাণবাবু। এই ফোটোগ্রাফি ছিল আমার শখের জিনিস। চাকরি-বাকরিতে সুখ হল না তাই এই স্টুডিয়ো। কিন্তু এখন দেখছি ব্যবসাও আমার ধাতে নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন এখনো সেই অ্যামেচার ফেটোগ্রাফারই রয়ে গেছি। স্টুডিয়োটা যেন আমার নয়, আর কারো। আমি যেন এখানে আড্ডা দিতে গল্প করতে আসি, রোজগার করতে আসিনে।'

হেসে বললাম, 'আপনার তো তাহলে কল্পনাশক্তি খুব প্রবল। শুনেছি দাম্পত্য জীবনের ক্ষণস্থায়ী রোমান্সকে চিরস্থায়ী করবার একমাত্র উপায় নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রী মনে করা। পরস্ত্রী মাত্রেই পরী। আর নিজের দোকানকে যদি পরের দোকান বলে ভেবে নেওয়া যায় তাহলে যত খুশি কাজ ফাঁকি দিলে চলে। লাভ লোকসান নিয়েও মাথা ঘামাতে হয় না।'

শৈলেনবাবুও হাসলেন, 'কিন্তু সেই পরীর রাজ্যে তো বেশিক্ষণ থাকবার জো নেই। ছেলেবেলায় গাঁয়ের বাড়িতে দিদিমা ঠাকুরমার মুখে পরীতে পাওয়ার গল্প শুনতাম। অল্পবয়সী সুন্দর সুন্দর ছেলেদের তখন প্রায়ই পরীতে পেত। পরী তার দুটি ডানায় তুলে তার সেই ভালোবাসার জনকে অজানা রূপরসের রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে যেত। সেখানে কত আরাম বিরাম দামী দামী জিনিসপত্র। কত খাবারদাবার -রাজভোগ, সীতাভোগ, মোহন-ভোগ। কত সম্ভোগের সামগ্রী। দিদিমা গল্প করতেন। কিন্তু সেই সুন্দর ছেলের ভাগ্যে বেশিদিন পরীর ভালোবাসার সুখ সইত না। দুচারদিন বাদেই দেখা যেত সেই ছেলেটি হয় নদীর ধারে কাদার মধ্যে, না হয় তেপান্তরের শুকনো মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।'

আমি বললাম, 'মানে আপনি বলতে চান কল্পনার পাখায় যারা উড়তে চায় এইসব পৃথিবীতে তাদেরও সেই দশাই হয়। সারাজীবন তাদের দুঃখের অবধি থাকে না।'

শৈলেনবাবু কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

স্টুডিয়োর সামনে দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে বাস যাচ্ছে, আসছে। সরকারী বেসরকারী সব বাসই চলে। রাস্তার দুদিকে দুটি স্টপ। এই স্টুডিয়োর দোরের সামনে টুলটিতে বসে যাত্রীদের ওঠানামা বেশ দেখা যায়। কেউ বা ঠিক সময়ে উঠে বসেছে। কেউ বা বাস ছাড়ার আগের মুহূর্তটিতে ছুটতে ছুটতে আসছে। কেউ স্থির চিত্র, কেউ চলচ্চিত্র। আবার একই মানুষের

দুই রূপ। কখনো স্থির কখনো চঞ্চল। শৈলেনবাবুও সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'এও এক নেশা জানেন? এই দেখার নেশা আর ফোটো তোলার নেশা। গাঁজা আফিং মদ চরসের নাম শুনেছি, ওসব নেশা কোনদিন করে দেখিনি। কিন্তু এই একটি নেশার মর্ম যে কী তা ভালো করেই জানি। শুধু একটি সূর্যাস্তের ছবি তুলবার জন্যে দিনের পর দিন বিকেলবেলায় গিয়ে ক্যামেরা হাতে নদীর ধারে বসে থেকেছি। পছন্দ আর হয় না। সময় তো গেছেই, কত ফিল্ম যে নষ্ট হয়েছে তার ঠিক নেই।'

একটু থেমে শৈলেনবাবু আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তবু তো ফোটোগ্রাফিকে আপনারা আর্ট বলেন না। কিন্তু আর্টই হোক আর ক্রাফটই হোক, জ্বালা একই। আপনার হাতে কলমই থাকুক, তুলিই থাকুক আর ক্যামেরাই থাকুক, চোখে সেই একই দেখবার নেশা। রূপ দেখবেন আর রূপ ধরে রাখবেন। কিন্তু নেশা মাত্রই মানুষকে নাশ করে। তার বুদ্ধিশুদ্ধি সব নষ্ট করে দেয়। যে সাপ নিয়ে সাপুড়ে খেলা দেখায় অনেক সময় সেই সাপের হাতেই তার মৃত্যু।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি তো সেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'বেঁচেছি কিনা বলা শক্ত। হয়তো মরে বেঁচে আছি। দেখুন নেশার মার দুরকমের। করাতের মত তার দুদিকেই ধার। নেশা থেকেও মারে, চলে গিয়েও মারে। এখন নেশাটাকে পেশা বানিয়ে ফেলেছি, যা ছিল শখ তাই হয়েছে রুজি-রোজগার। ফলে হয়েছে কি জানেন? জীবনটা খুব ভদ্র হয়েছে, বনের বাঘ পোষ মেনে খাঁচায় এসেছে, কিন্তু তার জোর আর তেমন নেই। এ যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া বোঝা বয়ে বয়ে ধোপার গাধা হয়ে গেছে।'

শিল্পের মাধ্যম কবায়ত্ত হলে তাতে সুবিধে বেশি না অসুবিধে বেশি চট করে বলা শক্ত। আমি চুপ করে রইলুম।

শৈলেনবাবু বলতে লাগলেন, 'তবু এই ভালো। আমাদের মত সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ছাড়া আগুনের চেয়ে ঘরের দীপেই মঙ্গল। চোখের সামনে একজনের সর্বনাশও তো দেখলাম।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার সর্বনাশের কথা বলছেন?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'আমার এক বন্ধুর। বেশ ভালো অবস্থা ছিল। বাপ বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। হিসেব করে চললে সারা জীবন বসে খেতে পারত। কিন্তু তাকে এই নেশায় পেয়ে বসল। থিয়েটার রোডের মত জায়গায় স্টুডিয়ো খুলল—আড়াই হাজার টাকা দিয়ে ক্যামেরা কিনল। দামী

দামী ফার্নিচার দিয়ে ঘর সাজাল। এখন আর কিচ্ছু নেই, এখন পথের ভিখিরি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'ওই নেশা। গাঁজা নয় মদ নয়—তার চেয়েও মারাত্মক নেশা মডেল। প্রথম প্রথম সেও ল্যান্ডস্কেপের পিছনে ছুটত। সময় নষ্ট করত, ফিল্ম নষ্ট করত। যতক্ষণ না মনের মত ছবিটি ক্যামেরায় ধরা পড়ত ততক্ষণ সে কিছুতেই ক্ষান্ত হত না। কিন্তু ভেসে যাওয়া মেঘকে ধরা কি সহজ। যে রূপ এই আছে এই নেই, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে যা মিলিয়ে যায় তাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা কি সোজা কথা? তবু সে পাগলের মত ছুটত। তারপর কী করে লতা পাতা নদী পাহাড়ের সঙ্গে তার চোখে আরো এক বস্তু পড়ল তা জানিনে। সেই বস্তু সব ছাড়িয়ে গেল। তা সমস্ত ল্যান্ডস্কেপকে আড়াল করে দাঁড়াল। বুঝতে পারছেন আমি কিসের কথা বলছি?'

বললাম, 'মেয়ে তো?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। প্রথমে তা মডেলের রূপ নিয়েই এল। আর্টিস্টের কাছে লতা পাতা ফুল ঝরনা নদীও যা মেয়েও তাই। কিন্তু সত্যি সত্যিই তো আর মেয়েরা ল্যান্ডস্কেপ নয়। তাদেরও রক্ত আছে, মাংস আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, আছে ক্ষুধা তৃষ্ণা জাগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। আমার সেই বন্ধু তার নতুন ল্যান্ডস্কেপের পিছনে ছুটতে লাগল। সেই ল্যান্ডস্কেপ কি একটি? পৃথিবীতে কি একটি লতা একটি পাতা একটি নদী আছে? যত বস্তু তত রূপ। কিন্তু সে আর কোনদিকে না তাকিয়ে শুধু মুখে মুখে রূপ খুঁজে বেড়াতে লাগল। আমরা যাকে সুন্দর দেখতাম না, আমার সেই বন্ধু তাকেও সুন্দর দেখত। তার চোখে পড়বার জন্যে তিলোত্তমা হবার দরকার ছিল না। নাকে মুখে চোখে ঠোঁটে, চুলে, চিবুকে, চলবার ভঙ্গিতে, দেহের গড়নে তিলপ্রমাণ রূপেই সে উন্মাদ। আর সেই রূপ কার না আছে বলুন? কিন্তু সবাইর কাছেই কি যাওয়া যায়? সবাইকেই একজন কাছে পেতে পারে? একজনের মধ্যে সব পাবার শিক্ষা করতে হয়। আমার সেই বন্ধু সেই সুশিক্ষার ধার দিয়েও গেল না। আর্টিস্টের আদর্শভ্রষ্ট হয়ে সে শুধু এক মডেল ছেড়ে আর এক মডেলের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। ক্রমে দেখলাম সে শুধু নিউড মডেলের ফোটো তুলছে। নানা ধরনের নানা ভঙ্গীর ছবি। কিন্তু শুধু ওই। আর কোনদিকে তার চোখ নেই। সাজপোশাক সব যেন রূপের পক্ষে বাধা দেখার পক্ষেও বাধা।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম, বললাম, 'তারপর?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'তারপর আর কি? তারপর একেবারে ডুবে গেল। তান্ত্রিকের সাধনার মত ও সাধনা তো সহজ নয়, বড় কঠিন। সবাইর সয় না। ওরও সইল না। এখন আর কিছু নেই, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ও এখন একটা খারাপ জায়গায় কাদার মধ্যে পড়ে আছে। অথচ কী ভালো ভালো ছবিই না ও এক সময়ে তুলেছে। প্রাইজ পেয়েছে, প্রশংসা পেয়েছে। ওর তোলা ফোটো আমার বাসায় কিছু কিছু আছে। যদি দেখতে চান একদিন এনে দেখাব।'

ছবির কথায় আমি ফের সামনের দেয়ালের দিকে তাকালাম। কয়েকখানা ফোটো এনলার্জ করে বাঁধিয়ে ঘরে টানিয়ে রেখেছেন শৈলেনবাবু। কিছু ল্যান্ডস্কেপ আছে, আর আছে একটি রূপবতী তরুণীর প্রতিকৃতি। দোরের পাশে কাঁচের শো-কেসে ছোট আকারেও এই ছবিখানা রয়েছে মনে পড়ল।

আমি সেই শো-কেসের কথাটাই প্রথমে তুললাম। বললাম, 'আপনিও ঢের ভালো ভালো ছবি তুলেছেন। আপনার শো-কেসে এবার কিছু নতুন ছবি দেখলাম। ছোট্ট ছেলেটির ফোটোখানা বেশ সুন্দর হয়েছে।'

শৈলেনবাবু সবিনয়ে হাসলেন, 'শিশুদের মুখ তো অমনিতেই সুন্দর। যেভাবেই তুলুন ভালোই দেখায়। দেখলেই চোখ জুড়োয়।'

বললাম, 'তাছাড়া প্রৌঢ় দম্পতির ছবিখানা নতুন মনে হল। ভদ্রমহিলাটি বেশ মোটা মোটা। ভদ্রলোক ঠিক তেমনি সরু আর পাতলা। ওয়ান-থার্ড জায়গা মাত্র নিয়েছেন। বেশ সার্প চেহারা। যৌবনে বেশ সুপুরুষ ছিলেন বোঝা যায়।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এ পাড়ার প্রফেসার রায় আর তাঁর স্ত্রী। চেহারায় অত অমিল হলে কী হবে—ভারি মিল দুজনের মধ্যে। রোজ এক সঙ্গে বেড়ান। ফি বছর বিয়ের অ্যানিভারসারি করেন। আর সেই উপলক্ষে একবার করে ফোটো তুলে যান। কোনদিন দুজনের ঝগড়াঝাটি হয় না। এই বয়সেও এমন জমাট ভাব কী করে বজায় রাখতে পারলেন তাই ভাবি। নিশ্চয়ই আপনার ফরমুলার সাহায্যে নয়, নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রী মনে করে নয়। ভারি গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষ। ভদ্রলোক ওসব কথা শুনলে কানে আঙুল দেবেন।'

শৈলেনবাবু হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'আপনার শো-কেস আর অ্যালবামের ছবিগুলি জড়ো করলে বোধহয় এ পাড়ার একটি ফুল-লেংথ ডকুমেন্টারী ফিল্ম হয়ে যায়। আপনি বলছিলেন এখানে যারা ফোটো তুলতে আসে তাদের এক একজনকে নিয়ে আমি এক একটি করে গল্প লিখতে পারি। কিন্তু এরই মধ্যে আপনি যাদের ছবি তুলেছেন তাদের মধ্যেও যে কত গল্প লুকিয়ে আছে কে জানে।'

শৈলেনবাবু বললেন 'সব ছবির পিছনেই যে গল্প আছে তা নয়। তবে কোন কোন ছবির পিছনে আছে বই কি।'

আমি ফের দেয়ালের ফোটোখানার দিকে তাকালাম। দুটি শো-কেসের মধ্যে. সারা ঘরখানার মধ্যে এমন সুন্দর ছবি আর নেই। একখানি হাত আর একখানি হাতের ওপর রেখে শান্ত গম্ভীরভাবে মেয়েটি বসে রয়েছে। তবু এই রূপকে চোখ-জুড়োন নয়, চোখ-জ্বালানো রূপই বলতে ইচ্ছা করে। মেয়েটি জানে নিজে স্থির শান্ত থেকে কী করে দর্শকের চোখকে অস্থির অশান্ত করে তুলতে হয়।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শৈলেনবাবুর দিকে তাকালাম। একটু বাদে বললাম, 'ওই ছবিটি বোধহয় পুরনো। অনেকদিন ধরেই দেখছি ওখানে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না কোন্ ছবির কথা বলছি। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে তুলেছিলাম।'

বললাম, 'ইনিও কি এ পাড়ার?'

শৈলেনবাবু একটু হেসে বললেন, 'কেন, আপনার কি চেনা চেনা লাগছে?'

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'না তা কেন লাগবে। আমি ওঁকে চিনিনে।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'আপনি বললেন, চেনেন না। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই কিন্তু নানারকম জল্পনা কল্পনা করে। কেউ বলে চেনাচেনা। কেউ বা স্পষ্টই চিনে ফেলে। আমি মনে মনে হাসি। সব মিথ্যে কথা। কেউ ওঁকে চেনে না। কী করে চিনবে? এ পাড়ার কেউ নন, এ শহরের নন, বলতে গেলে এ রাজ্যেরও নন।'

বললাম, 'তবে কে ইনি?'

শৈলেনবাবু একটুকাল চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'পুরো পরিচয় আমিও আপনাকে ঠিক বলতে পারব না। তিন বছর আগে একদিন সন্ধ্যাবেলায় পার্কের ওদিক থেকে ঘুরে ঘুরে ওঁরা আমার এই স্টুডিয়োতে এসে উপস্থিত। ওঁর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। মেয়েটির বয়স তেইশ চব্বিশ। সঙ্গের ভদ্রলোকের বয়স এই বছর তিরিশের মধ্যেই হবে। সুন্দর না হলেও কালো কুচ্ছিত নয়। স্বাস্থ্য ভালো, দেখে মনে হয় অবস্থাও ভালো। বেশ সবল শক্তিশালী পুরুষ। মেয়েটির পরনে ফিকে আসমানী রঙের শাড়ি। গায়ের রঙ এমন যাতে সব রঙই মানায়। ভদ্রলোক একেবারে ফিটফাট সাহেব। দুজনকেই বেশ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ বলেই মনে হল। এমন পার্টি তো বেশি আসে না। আমি তাঁদের খুব আদর করে বসতে দিলাম। সুধীর সেদিন কামাই করেছে। আমিই ভিতর

থেকে দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এলাম। মেয়েটি বললেন, 'আপনি কেন এত কষ্ট করছেন।'

ভারি মিষ্টি গলা। কথায় ভারি দরদ। শুনে মনে হল যদি একটু কষ্ট করেও থাকি তা সুদে-আসলে উঠে এসেছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা ছবি তুলব।'

মেয়েটি চাপা গলায় আপত্তি করতে লাগলেন, 'কী যে তোমার খেয়াল। কেন, ছবি তুলবার কী হয়েছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কী আবার হবে। ছবি তুললে বেশ দেখাবে।'

সঙ্গের মেয়েটি বললে, 'থামো। সময় নেই অসময় নেই, স্থান নেই অস্থান নেই, ছবি তুললেই হল।'

এ কথায় আমি একটু হেসে বললাম, 'দেখুন, আমার স্টুডিয়ো ছোট, আমিও গরীব মানুষ। তবে ছবি আপনাদের খারাপ হবে না। অ্যালবামটা দেখুন।'

মেয়েটি হেসে বললেন, 'না না না; সে কথা বলছিনে। আপনার স্টুডিয়োটি আমার বরং ভালোই লেগেছে। বেশ সাজানো গোছানো পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। আপনার হাতের কাজও তো দেখতে পাচ্ছি। বেশ উঁচু জাতের ফোটো। কিন্তু এখন আমারই আসলে ছবি তুলবার মুড নেই। চলো।'

তিনি তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকালেন।

ভদ্রলোক আমাকে হঠাৎ বললেন, 'মুড আপনি এনে দিতে পারবেন না?'

আমি হেসে বললাম, 'আপনারা ভিতরে গিয়ে বসুন, মুড আপনিই চলে আসবে।'

এসব কাস্টমারের কাছে রেটের কথা তোলার দরকার হয় না। তবে সাইজটা পছন্দ করিয়ে নিলাম। ওঁরা ভিতরে গিয়ে বসলেন। মেয়েটি একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেলেন বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার সায় তখন ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গেই আমার ইচ্ছার মিল।

দুখানা চেয়ারের মধ্যে হাতলের ব্যবধান থাকে। টুলে সেই ফাঁক নেই। যে টুলটিতে আপনি বসে আছেন ওই টুলখানিই আমি তাই ভিতরে নিয়ে গিয়ে ওঁদের বসতে দিলাম। ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে কালো পর্দা টানানো আছে। ক্যামেরাটা একবার দেখে নিয়ে আমি বললাম, 'আপনারা কি ফুল টুল কিছু নিয়ে তুলবেন? কাগজের ফুল আছে। ফ্লাওয়ার-ভাস আছে।'

মেয়েটি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, ওসবের কিছু দরকার নেই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তো মশাই ভারি বেরসিক। কাগজের ফুল দিয়ে কী হবে?'

মেয়েটি চাপা গলায় ধমক দিলেন, 'আঃ কী হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'দেয়ালে আয়না চিরুনি রয়েছে, আপনারা ইচ্ছে করলে—। আচ্ছা আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আপনারা তৈরী হয়ে নিন।'

পর্দা টেনে দিয়ে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ওঁদের চাপা গলার কথাবার্তা আমার কানে যেতে লাগল। এটা অবশ্য ভদ্রতাবিরুদ্ধ। কিন্তু কী করব বলুন, কানে তো আর তুলো দিয়ে রাখতে পারিনে।'

শুনতে পেলাম মেয়েটি তখনো আপত্তি করছেন, 'কী যে তোমার খেয়াল। হঠাৎ এমন একটা জায়গায় এসে তোমার ছবি তুলবার রোখ চাপল। কেন?'

যুবকটি বললেন, 'রোখ নয়, শখ বলো। আমার এইসব অচেনা অজানা স্টুডিয়ো, আর অখ্যাত অজ্ঞাত হোটেল রেস্টুরেণ্টই ভালো লাগে। ভারি রোমাণ্টিক মনে হয়। যেন নিজেরা নিজেদের পছন্দমত জায়গা আবিষ্কার করে নিয়েছি। কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের চেয়ে এর গৌরব কম নয়। তোমার কি তাই মনে হয় না?'

মেয়েটির কোন জবাব শুনতে পেলাম না। মেয়েরা তো আর পুরুষদের মত নয়। ভারি চাপা। অমনিতে তাঁরা হাজার কথা বলেন। কিন্তু যা বলতে চান না তা তাঁদের মুখ থেকে বার করে কার সাধ্য।

এরপর ছবি তুলবার ধরন-টরন নিয়ে ওঁদের মধ্যে মতান্তর হচ্ছে বলে মনে হল।

মেয়েটি বলছেন, 'তুমি যদি অমন কর আমি কিছুতেই ছবি তুলব না। অমন অসভ্যের মত আমি কিছুতেই তুলতে পারব না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আঃ আস্তে। বেশ, তুমি যেভাবে বলছ সেইভাবেই তোলা হবে। মাঝে মাঝে তুমি এমন বাড়াবাড়ি কর রোশেনা।'

এরপর ওঁরা আমাকে ভিতরে ডাকলেন। আমি পাশাপাশি বসিয়ে ছবি তুলে নিলাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই বসেছিলেন ওঁরা। এমন একটি মানানসই যুগল রূপ আমি বহুকাল তুলিনি।

একটু বাদেই ওঁরা বাইরে এলেন।

ভদ্রলোক দশ টাকা আগাম দিলেন আমাকে। অত দরকার ছিল না। তিন কপির দাম মোট বারো টাকা।

রিসিট দেওয়ার সময় ওঁর নাম ঠিকানার দরকার হল।

ভদ্রলোক নাম বললেন, আনোয়ার হোসেন। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'অ্যাড্রেস লিখবার দরকার নেই। আমরা পাকিস্তানে থাকি। বেড়াতে এসেছি। শিগগিরই এখান থেকে চলে যাব। আপনি কবে ডেলিভারি দিতে পারবেন বলুন।'

ছবিটা যাতে ভালো হয় তার জন্যে আমি দুদিন সময় হাতে নিলাম।

ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

অন্য সব কাজ ফেলে রেখে নিজের গরজেই ওঁদের ফোটোটা আমি আগে শেষ করলাম। নিজের কাজ দেখে নিজেরই ভালো লাগল। মনে হল আমার কাস্টমাররাও খুশি হবেন।

আশ্চর্য! পরদিন বিকেলবেলায় একটি ট্যাক্সী এসে আমার এই স্টুডিয়োর সামনে দাঁড়াল। আজ আর দুজনে না, মেয়েটি একাই এসেছেন।

আমি হেসে বললাম, 'আপনি একদিন আগেই এসে পড়েছেন। তাতে অবশ্য আমার কোন অসুবিধে হয়নি। আমি আপনাদের ফোটো তৈরী করে রেখেছি।'

মেয়েটি গম্ভীর মুখে বললেন, 'এরই মধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন? অনেক ধন্যবাদ। ছবিগুলি আমাকে দিন।'

আমি তিন কপি ফোটো ওঁর হাতে তুলে দিলাম।

ভাবলাম তাঁর মুখে এবার হাসি ফুটবে। কিন্তু তা ফুটল না। তিনি ছবির দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখলেন না। আমার হাতে নিঃশব্দে বারোটি টাকা তুলে দিলেন।

আমি বললাম, 'সে কি! দশ টাকা তো আমি আগেই পেয়েছি।'

মেয়েটি বললেন, 'তাঁর টাকা তাঁকে ফেরত দেবেন। হ্যাঁ নেগেটিভখানাও আমার চাই। কত টাকা লাগবে বলুন?'

আমি বললাম, 'টাকা কেন লাগবে। কিন্তু নেগেটিভ দিয়ে আপনি কী করবেন।'

মেয়েটি বললেন, 'আমার দরকার আছে। আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনাকে। দয়া করে দিয়ে দিন। কালকের বিকেলের আমি কোন চিহ্ন রাখতে চাইনে।'

এরপর আর কোন কথা চলে না। আমি নেগেটিভখানাও ওঁকে দিলাম।

এবার একটু খুশি হলেন তিনি। বললেন, 'আপনি আমার উপকার করলেন। আপনি জানেন না এ ছবি থাকলে আমার কী ক্ষতি হত।' এর বেশি তিনি আমাকে জানালেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

তিনি আর একবার ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন হঠাৎ আমি সাহস করে একটি প্রস্তাব করে বসলাম, 'বুঝতে পারছি আপনি গ্রুপ ফোটো রাখতে চান না। যদি কিছু মনে না করেন আপনার একখানা সিঙ্গল ফোটো আমি তুলে দিচ্ছি।'

তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কী একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা

তুলুন। আপনি যখন আমার জন্যে এত করলেন আপনার অনুরোধও আমার রাখা উচিত। কিন্তু খবরদার, আমি ছাড়া এই ফোটো যেন আর কারো হাতে না পড়ে।'

আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর ভিতরে গিয়ে. আমি ওঁকে যত্ন করে বসালাম। কিন্তু ছবি তুলবার মুড ওঁর নেই। ইচ্ছাও নেই। কিন্তু আমার অনুরোধ তিনি রাখলেন। ক্যামেরার সামনে বসলেন। কতটুকুই বা সময়। কিন্তু আমার মনে হল— অনেককাল—অনেককাল বাদে আমি পছন্দমত একখানা ছবি তুলতে পারছি।

একটু বাদেই আমরা বেরিয়ে এলাম।

তিনি আমাকে দশ টাকা অ্যাডভান্স করতে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'থাক না, এক সঙ্গে দেবেন। সামান্য ব্যাপার।'

তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠলেন. আমি তাঁকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই ভদ্রলোক এসে হাজির। তিনিও গাড়ি করে এসেছেন। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। চোখেমুখে কেমন এক ধরনের রুক্ষ রুক্ষ ভাব। দোকানে ঢুকে কাউণ্টারের ওপর রিসিটটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'কই আমার ফোটোগুলি দিন।'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে। বড় দুঃখের ব্যাপার হল। আপনি টাকাটা ফেরত নিন। ওঁকে নিয়ে আর একদিন আসুন। আমি ফের আপনাদের ফোটো তুলে দেব। কোন খরচ লাগবে না।'

ভদ্রলোক যেন ফেটে পড়লেন. 'চালাকি পেয়েছেন। আমি আপনার নামে পুলিস কেস আনতে পারি তা জানেন? ভালো চান তো আমার ফোটো দিয়ে দিন।'

আমি শক্ত হয়ে বললাম, 'পুলিস কেস আপনার নামেও আনা যায়। বেশি তড়পাবেন না। টাকাটা নিয়ে মানে মানে সরে পড়ুন।'

গোলমাল শুনে রাস্তার লোক এসে ভিড় করল। আশেপাশে দোকানগুলির লোকজন আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। সবাই আমার পক্ষে। ভদ্রলোক আগাম টাকাটা ফেরত নিয়ে শেষ পর্যন্ত চ'লেই গেলেন। কিন্তু হতাশায় অপমানে দুঃখে লজ্জায় তাঁর মুখের সে কি চেহারাই না হল। সে মুখ আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।

ভেবে পেলাম না ভদ্রলোক শুধু ফোটোখানা নিয়ে কীই বা করতেন। যে সম্পর্ক ভাঙে তাকে কি আর কেউ জোর করে ধরে রাখতে পারে? তবু তো মানুষ চেষ্টা করতে ছাড়ে না।

ওঁরা যে স্বামী-স্ত্রী নয় তা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু মেয়েটি কুমারী না পরস্ত্রী তা ধরতে পারিনি। ওঁরা তো আর সিঁদুর টিঁদুর পরেন না। কাজ-কর্ম বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে বসে বসে ভাবতে লাগলাম কতদিনের ওঁদের সম্পর্ক, কতখানি গভীর হয়েছিল, কী কী কারণে ঝগড়াটা হতে পারে। মনে মনে বিরাট এক নভেল লিখে ফেললাম মশাই।

ফোটোখানা খুব যত্ন করে শেষ করলাম। বহু সময় নিয়ে রিটাচ করলাম, ভালো কাগজে এনলার্জ করলাম। ভাবলাম, যাঁর ফোটো, দেখে তিনি কী খুশিই না হবেন। সে-ই আমার বড় পুরস্কার।

কিন্তু তিনি আর এলেন না।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'এলেন না?'

শৈলেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না, অদ্যাবধি আসেননি। প্রথম প্রথম আমি খুব আশায় আশায় ছিলাম। এই বুঝি আসেন, আসেন কিন্তু কই। অবসর সময়ে বসে বসে কত কীই না ভাবি। হয়তো খুব জরুরী কাজে, কি মনে খুব দুঃখ পেয়ে ব্যথা পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গেছেন। এই তুচ্ছ ফোটোর কথা তাঁর আর মনেই পড়েনি। একেক সময় মনে হয় তিনি খুব সুখে শান্তিতে আছেন। একেক দিন মনে হয় তাঁর দুঃখের আর শেষ নেই। কোন কোনদিন ভাবি তাঁদের ফের মিল হয়ে গেছে। আবার কোনদিন বা মনে হয় মিল হয়নি। ভদ্রলোক নতুন কাউকে খুঁজে পেতে ঘর বেঁধেছেন। কিন্তু তাঁর আর ঘর জোটেনি। মানুষের মন। সে মন কত রকমের কথাই বলে। কোনটা সত্যি হয়, কোনটা মিথ্যে। কোনটা ফলে, কোনটা ফলে না। তবু তার বলার বিরাম নেই।'

শৈলেনবাবু চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, 'আচ্ছা ধরুন, তিনি যদি হঠাৎ ফের একদিন এসে হাজির হন আপনি কী করবেন।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'কী আর করব। যত পারি ছবি তুলে নেব। আমার মনে হয় তাতে তিনি আপত্তি করবেন না। সেদিনও করতেন না। সেদিনও যদি বলতাম আমি আপনার আরো ফোটো তুলব তিনি রাজী হয়ে যেতেন। কিন্তু বলতেই পারলাম না, চাইতেই পারলাম না—।'

ক্ষোভ আর আক্ষেপের মধ্যে শৈলেনবাবু যেন ডুবে রইলেন।

আমি এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলি শৈলেনবাবু, অনেক বেলা হল।'

শৈলেনবাবু চমকে উঠলেন। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললেন, 'আরে শুনুন শুনুন। আপনি কি সব বিশ্বাস করলেন নাকি?'

হেসে বললাম, 'বিশ্বাস করব না?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'আরে না মশাই। যত সব বানানো ব্যাপার। আপনারা বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখেন। আমাদেরও কি মাঝে মাঝে সেই সাধ হয় না? আমরা সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করি। কী করে তাদের খাওয়াব পরাব সেই ভাবনায় অস্থির। আমাদের কি আর অন্য কোন চিন্তা মনে আসে? না, আসা উচিত? ওসব নেশা বড়লোকেরই সাজে। বুঝলেন?'

ঘাড় কাত করে জানালাম বুঝেছি। তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ইচ্ছা করলে অবিশ্বাসতার আবরণ টানা যায় বই কি। সেদিনের সেই আলাপের পর যাতায়াতের পথে কতদিন দেখেছি কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে শৈলেনবাবু তাঁর খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর স্টুডিয়োতে যে সবচেয়ে শস্তায় সবচেয়ে ভালো ছবি তৈরি হয় তা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই মূর্তি দেখে কে বিশ্বাস করবে যে ও ধরনের কোন ঘটনা তো ভালো—ঘটনার কল্পনাও তাঁর মনে কোনদিন আসতে পারে। যেসব যাত্রী এদিককার বাস-রুটগুলি দিয়ে চলাফেরা করেন, জানলা দিয়ে তাঁদের কারো কারো চোখ যদি হঠাৎ এই পথের ধারের সুরুচি স্টুডিয়োর সাইনবোর্ডটির ওপর গিয়ে পড়ে তাঁরা নিশ্চয় কেউ ভেবে বসবেন না যে, সত্যিই অমন ছোট একটু নাটকীয় ঘটনা ওখানে ঘটেছিল আর তার রেশ হিসেবে এক ফোঁটা রহস্য এখনো ওই দোকানটুকুর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

॥ বা সি ব কু ল ॥

এ যুগের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়বে না কেন, পড়ে। কিন্তু সেই পতন অধঃপতন নয়। আজকাল ব্যর্থ প্রেমে কেউ বাউণ্ডুলে হয়ে যায় না। মেয়েই হোক ছেলেই হোক, লেকের জলে ডুবে মরে না। আঘাতটা যে যার সামলে নিয়ে কাজকর্মে মন দেয়। আবার প্রেম যাদের সার্থক হয়, তারাও আজকাল সমাজ-সংসার মিছে মনে করে দিনরাত মুখোমুখি বসে থাকে না। বরং দু'হাত আর দু'হাত চার হাতে টাকা রোজগারের চেষ্টা করে, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনে, সমাজে প্রতিষ্ঠা—। মোট কথা, এ যুগের মানুষের মত এ যুগের প্রেমও যুক্তির হাতে হাত রেখে চলে।'

দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। বয়সের দিক থেকে কেউ আধুনিক নন। দুজনেই পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছেন। যিনি আধুনিক যুগের মধ্যে যুক্তি আর যুক্তির মধ্যে মুক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁকে অপেক্ষাকৃত তরুণ আর স্বাস্থ্যবান্ দেখায়, তাঁর চুলে বিশেষ পাক ধরেনি, দাঁতও প্রায় অটুট রয়েছে। বোঝা যায় জরার সঙ্গে তিনি বেশ কিছুদিন যুদ্ধ করতে পারবেন, জীবন-সংগ্রামেও তাঁর হাতিয়ার বেশ শক্ত। হেস্টিংস স্ট্রীটে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের তিনি অংশীদার।

আর যিনি চুপ করে উদ্দীপ্ত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁর মাথার চুল অর্ধেকের বেশি পেকে গেছে। চেহারাটা মোটাসোটা বলে বয়সের চেয়েও প্রবীণ মনে হয়। একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে কাজ করেন। নিজের অ্যাকাউণ্টে কিছু জমেনি। যা আয়, ব্যয়ের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি। ছেলের চাকরির তদ্বিরে তিনি নিউ আলীপুরে বন্ধুর কাছে এসেছেন। বন্ধু তাঁকে চা সিগারেটে আপ্যায়ন করেছেন। কথায় কথায় যুবশক্তির প্রসঙ্গ এসেছে। যৌবনের সঙ্গে প্রেম।

ব্যাঙ্কের অফিসার মণিমোহন তাঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি যে প্রেমের কথা বলছ তা শুধু এ যুগের বৈশিষ্ট্য কেন হবে। নারী-পুরুষের সাধারণ স্বাভাবিক আকর্ষণ আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। একজন আর একজনকে পছন্দ করে, দুদিন পরে ভুলে যায় কি বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করতে থাকে। এই চেনা-পথে বাঁধা-পথে সংসারের লাখ লাখ লোক হাঁটে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না অনিমেষ।'

এঞ্জিনিয়ার বললেন, 'তবে কাদের নিয়ে মাথা ঘামায়?'

বন্ধুর অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে মণিমোহন ফের একটু হাসলেন—'যারা নির্বোধের মত লেকের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিষ খায়, জীবনটাকে ছারখার করে দেয় হয় নিজের না হয় আর একজনের—কি দুজনেরই। তাদের খবরই কাগজে ওঠে, তাদের নিয়েই গল্প হয়, নাটক হয়। আর আমরা যারা নিশ্চিন্তে বাড়ি-গাড়ি করি, কি অফিসের ডেবিট-ক্রেডিট মিলাই তারা ওই সব মাথাখারাপ ছেলেমেয়েগুলির কান্ডকারখানা নিয়ে আলোচনা করি, উত্তেজিত হই - ।'

এঞ্জিনিয়ার হেসে বললেন, 'তোমার কথা বাদ দাও। তুমি জীবনেও কোনদিন উত্তেজিত হওনি। কিন্তু তুমি যাদের কথা বললে তাদের নিয়ে সংসার চলে না। তারা সমাজ-সংসারের কেউ নয়।'

মণিমোহন ঠান্ডা চায়ের কাপে আর একবার ঠোঁট ছোঁয়ালেন। তারপর হেসে বললেন, 'নয়ই তো! তবু আমরা যারা সমাজ-সংসার চালাই তারাও মাঝে মাঝে ওধরনের অচল কি অতিচঞ্চল দু-একটি নারী-পুরুষের মুখোমুখি হই। কেউ উত্তেজনায় ছটফট করি, কেউ বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকি। এতকাল বাদে সুনন্দাকে দেখে আমার তাই মনে হল।'

ঈজিচেয়ারে অর্ধশায়িত এঞ্জিনিয়ার এবার উৎসাহে শিরদাঁড়া খাড়া করে উঠে বসলেন। বললেন, 'সুনন্দা। সে আবার কে? নিজের স্ত্রীর অসুখ-বিসুখের কথা ছাড়া তোমার মুখে পরনারীর নাম তো কোনদিন শুনিনি। উঁহু, ও চা ঠান্ডা হয়ে গেছে, খেতে পারবে না। ওরে ও কানাই, মণিকে আর এক কাপ চা করে দে। আর দুটো সিঙ্গাড়াও নিয়ে আয়। আরে মাংসের সিঙ্গাড়া, খাও খাও। কানাইয়ের হাত মন্দ নয়। এখন ওই কানাইই ভরসা। স্ত্রী-পুত্র সব কালিম্পংএ। আমার তো শৈলাবাস টৈলাবাস নেই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সমান। মিস্ত্রীগিরি করি, পরের বাড়িঘর তুলে দিই। আমার কি আর নড়বার জো আছে? যাক ওসব। তোমার সুনন্দার গল্প শুনি। এই বিশাল মরুভূমিতে তবু এক চিলতে ওয়েসিস।'

অনিমেষের ছোকরা চাকর কানাই চা আনল, সিঙ্গাড়া আনল, সিগারেট আনল।

মণিমোহন বিকেলের আলোয় ধনী বন্ধুর লতামন্ডপ আর ফুলের টবগুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সেই আলো আরো ক্ষীণ আরো ম্লান হওয়ার পর মৃদুস্বরে বলতে লাগলেনঃ

"সুনন্দা আমার নয়, তবে আমার সহপাঠিনী এক সময় ছিল। সে কি আজ—তিরিশ বছর আগেকার কথা। তিরিশ বছর। কতকাল হয়ে গেল,

তাইবা? মাঝে মাঝে মনে হয় সে যুগ যেন তিন হাজার বছর পিছনে পড়ে রয়েছে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়—সে দিন সকাল।

আমাদের মফঃস্বল শহরের সেই কলেজে মাত্র দু'বছর আগে কো-এডুকেশন চালু হয়েছে। আমরা তৃতীয় ভাগ্যবান্ দল। আমাদের সহপাঠিনীর সংখ্যা পাঁচ। আমাদের সংখ্যা দশ-বারোগুণ বেশি। প্রফেসরের লেকচার শুনতে শুনতে কেউ যদি আড়চোখে চায় অমনি পঞ্চাশজন প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখের ঈর্ষা তাকে বিদ্ধ করে। কিন্তু ছেলেরাই চঞ্চল। দেখে শুনে মনে হয়, মেয়েরা পাষাণপ্রতিমা। তারা শুধু প্রফেসরের বক্তৃতা শুনতে আর নোট নিতেই এসেছে। পৃথিবীর আর কোন ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

অফ্ পিরিয়ডে কমনরুমে বসে কি ছুটির পর চাঁদমারির মাঠে বেড়াতে বেড়াতে আমরা কয়েকটি সতীর্থ মেয়েদের এই শীতলতা নিয়ে দুঃখ করতাম। এত সাধ্যসাধনার পর যদি বা রক্ষণশীল কলেজ-কর্তৃপক্ষ সহশিক্ষায় রাজী হলেন, ভাগ্যের এ কি বিড়ম্বনা, আমাদের সঙ্গে যারা বিদ্যা অর্জন করতে এল তারা প্রত্যেকেই অতিমাত্রায় সুশীলা, শুধু তাই নয় একেকটি শিলাবতী! নির্মল সিকদারের ক্ষোভ সব চেয়ে বেশি ফুটে বেরোত: 'আরে রেখে দাও শিলাবতী। একটি টোকা দিলে প্রত্যেকটি শিলা চৌচির হয়ে ফেটে যাবে।'

নির্মলকে আমরা মেয়েদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মনে করতাম। অনেক সরাসরি অভিজ্ঞতার বর্ণনা তার মুখে শুনেছিলাম। এখন বুঝতে পারি সে-সব চুরিকরা গল্প। পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের বলে চালিয়েছে। কিন্তু যত আস্ফালনই নির্মল আমাদের সামনে করুক, ওদের সামনে বীরত্ব দেখাবার সুবিধে ছিল না। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন কড়া। এরই মধ্যে তিনি নির্মলকে তার চালচলনের জন্যে শাসন করেছিলেন। হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টেরও কড়া নজর ছিল তার ওপর। তবু তার বড়াইর অন্ত ছিল না। সে বাজি রেখে ওদের সঙ্গে কোন না কোন ছলে কথা বলত। বাজিতে জিতে-পাওয়া টাকায় আমরা দল বেঁধে রেস্টুরেণ্টে খেতাম, লঞ্চে করে খানিকদূর বেড়িয়ে আসতাম। ক্লাসের সবচেয়ে রাশভারী মেয়ে সুনন্দা সেনের কাছ থেকে জেনারেল ফিলসফির বই ধার চেয়ে এনে নির্মল একবার দশ টাকা বাজি জিতেছিল। সে টাকা আমরাই চাঁদা করে দিয়েছিলাম। হেরে গিয়েও আমরা জয়ের গৌরব ভোগ করতাম। নির্মলের কৃতিত্বে যেন আমাদেরও অংশ ছিল। উৎসাহ পেয়ে নির্মল বাহাদুরী দেখিয়ে বলত, 'সাবজজের ওই পাষাণ-হৃদয়া তনয়াকে আমি একদিন বিয়ে করব, তবে ছাড়ব।'

আমরা হেসে উঠতাম। ব্যাপারটা এতই অসম্ভব যে কোন মন্তব্য পর্যন্ত করা চলে না।

পরেশ নাগ বলত, 'লাখ টাকা বাজি।'

নির্মল জবাব দিত, 'লাখ টাকা তোদের সাতজনকে সাতবার করে বিক্রি করলেও ওঠে না। কোথায় পাবি? সেই কনসিডারেশন থেকেই তো আমি এগোই না। নইলে—'

এ গল্পের নায়ক নির্মল নয় তবু তার কথাটাই এখন বেশি করে মনে পড়ছে, তার কারণ নির্মলই আমাদের প্রথমে খবরটা দিয়েছিল। চাঁদমারির মাঠের আড্ডায় সে-ই আমাদের অবাক করে দিয়ে বলেছিল, 'আরে...জানো আমাদের সুনীল হালদার লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমে পড়েছে।'

পরেশ বলল, 'সে কি! কার সঙ্গে?'

'কার সঙ্গে আবার। ওই সুনন্দার। ওই পাথর দিয়ে গড়া মূর্তির।'

পরেশ বলল, 'পাথর হলেও শ্বেতপাথর। আর মূর্তিটিও বড় মনোরম। যিনি গড়েছেন বেশ যত্ন করে গড়েছেন। নাক চোখ ঠোঁট চিবুক একেবারে কুঁদে কুঁদে বের করেছেন। যেন আমাদের মধু কারিগরের গড়া লক্ষ্মী-প্রতিমা।'

নির্মল ব্যঙ্গ করে বলল, 'দেখ দেখ জিভে কেমন জল এসে গেছে দেখ। লক্ষ্মী হোক, কলাবউ হোক, তাতে তোর কি? তুই তো পেঁচা।'

সুনীল অবশ্য পেঁচা নয়। সে দেখতে সুশ্রী। গৌরবর্ণ ছিপছিপে চেহারা। তবু এত ছেলে থাকতে নির্মল সুনীলের নামে এই অপবাদটা দিল দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। মুখচোরা শান্তশিষ্ট গম্ভীর স্বভাবের ছেলে সুনীল হালদার। ক্লাসে তেমন কোন বন্ধুবান্ধব ওর নেই। পরেশরা বলে, 'ম্যাট্রিকুলেশনে না হয় দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছ, আই. এ.-তে তো বাপু দুটি লেটার ছাড়া কিছু জোটেনি। অত দেমাক কিসের।'

কিন্তু আমি জানতাম সুনীল যে অমিশুক তা ওর দেমাকের জন্যে নয়। ওই ওর স্বভাব। কী করে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়, আলাপ জমাতে হয় তা ও জানে না। জানে না বলেই ওর এত সংকোচ।

সুনীল অবশ্য আমাদের দলের নয়। কিন্তু তা নিয়ে আমি অন্তত রাগ করিনি। ও কারো দলেরই ছিল না। ও একাই একটি দল। এক পাপড়ির ফুল। ফুলের সঙ্গেই তুলনা দিলাম। যেমন ওর চেহারায় তেমনি স্বভাবে নম্রতা আর লাবণ্য ছিল। প্রফেসররা মোটামুটি ওকে ভালোবাসতেন। মানে ভালোবাসতে চাইতেন। কিন্তু ও তাঁদের কারো আশাই পূর্ণ করেনি, না পরীক্ষার রেজাল্টে, না আসা-যাওয়ায় সামাজিকতায়, অনুরঞ্জনে, আনুগত্যে।

ক্লাসে সুনীলের বন্ধু না থাকলেও শত্রুও কেউ ছিল না। তাই আমি ওর পক্ষ নিয়ে বললাম, 'ও বেচারার বিরুদ্ধে কেন এই অপবাদ দিচ্ছ?'

নির্মল আমার কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'অপবাদ নয় মণি, অপবাদ নয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'দেখতে দেখেছি।'

তারপর সেই দেখার বর্ণনা দিল নির্মল। সুনীল নাকি বেছে বেছে ক্লাসের এমন জায়গাটিতে গিয়ে বসে যেখান থেকে সুনন্দার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। সুনীল নাকি যতক্ষণ ক্লাসে থাকে পলক ফেলে না। প্রফেসরদের মূল্যবান লেকচার ওর কানে যায় কি যায় না। কিন্তু প্রফেসররা যখনই সুনন্দাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেন সুনীল উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। আর আশ্চর্য, আমরা ক্লাসে এতগুলি ছেলে থাকতে প্রত্যেক প্রফেসরই সুনন্দাকে কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করেন। সুনন্দা নিরুত্তরা থাকে না। প্রত্যেককেই স্মিতমুখে স্নিগ্ধস্বরে জবাব দেয়। যুবক বৃদ্ধ কৃতী অকৃতী সব অধ্যাপকের ওপরই ওর সমান শ্রদ্ধা, সমান অনুরাগ!

আমাদের নির্মল আড়ালে এসে দাঁতে দাঁত ঘষেঃ 'একেবারে বর্ন-অ্যাকট্রেস। আমি যদি হিস্ট্রির বি. কে. রায়ের মত একটি ওঁছা প্রফেসর হয়েও প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়াতে পারতাম, তাহলে ওই জাত-অভিনেত্রীর অ্যাকটিং ছুটিয়ে দিতাম।'

আমরা হেসে বলতাম, 'এ জন্মে নয় নির্মল, এ জন্মে নয়। এ জনমে মিটিবে না সাধ।'

কিন্তু নির্মলের সাধ যেমন মিটবে না, সুনীলের সাধও কি মিটবে? জাতে এক নয়। তাছাড়া মুন্সেফ কোর্টের পেসকারের ছেলে সাবজজের মেয়ের দিকে তাকাতে সাহস পায় কিসের জোরে? ক্ষণপ্রভায় চোখ ঝলসে যাবে যে।

নির্মল বলে, 'বামন কি চাঁদের দিকে হাত বাড়ায় না? পতঙ্গ কি আগুনে ঝাঁপ দেয় না?'

একটু নজর দিতেই সুনীলের কিছু কিছু—তোমার ভাষায়—অধঃপতনের লক্ষণ আমাদেরও চোখে পড়ল। ও যেন আরো অমিশুক, আরো অসামাজিক হয়ে গেছে। চুল-দাড়ির ব্যাপারে যত্ন নেই, জামা আধময়লা, বোতাম কোনটা আছে কোনটার হদিশ মেলে না।

তারপর শোনা গেল, সুনন্দা যখন তার বাবা মা দাদা বউদি কি ক্লাসের অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে নদীর ধারে স্টীমারঘাটায় বেড়াতে যায়, সুনীল অনেক দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে। কোর্ট পাড়ায় সুনন্দাদের বাংলো-প্যাটার্নের

বাড়িটার দক্ষিণ দিকে যে ঝাউগাছের সারি আছে, তার আড়ালে আড়ালে সুনীলকে ঘুরে বেড়াতে আমিও কয়েকদিন দেখে ফেললাম।

পরেশ বলল, 'ওখানে গিয়েছিল কী করতে?'

নির্মল জবাব দিল, 'ঝাউবনের হাওয়ায় নিজের দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিতে।'

পরেশ বলল, 'ছি ছি ছি, অত হ্যাংলা কিন্তু আমরা হতে পারতাম না। পিছন দিয়ে ঘোরাঘুরি করে করুক। কিন্তু ওকে জানিয়ে দিয়ো নির্মল, সামনে যেন না যায়। ওদের একটা অ্যালসেসিয়ান আছে।'

নির্মল ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তুমি কি করে জানলে? তোমাকে তাড়া করেছিল নাকি?'

সুনন্দাদের আদবকায়দায় চালচলনে একটু বিলিতী গন্ধ থাকলেও নিজেদের সমাজে ভদ্রতা সৌজন্যের সুখ্যাতি ছিল। জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাবজজ মুন্সেফ কি নামকরা উকিলরা তো ওদের বাড়ির চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ পেতেনই, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল আরো দুচারজন ভাগ্যবান প্রফেসরকেও ওঁরা ডাকতেন। প্রফেসরদের সার্টিফিকেট পাওয়া সচ্চরিত্র মেধাবী দু'একটি ছেলেরও ও বাড়িতে ঢুকবার অধিকার ছিল। কিন্তু আমরা ত্রিসীমানায় যেতে পারতাম না। সুনীল হালদারেরও সেই দশা। আমার মনে হয় সুনন্দার বাবা মার সঙ্গে যদি ওর আলাপ হত, তাঁরা ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করতেন। সুনন্দার সঙ্গেও যদি স্বাভাবিক ভাবে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হত প্রেমে না পড়ুক, বন্ধুত্ব না হোক, সাধারণ কথাবার্তা সুনন্দা ওর সঙ্গে বলত, শিষ্টাচারের ত্রুটি হতে দিত না। সাহিত্য ইতিহাস ফিলসফি যে কোন বিষয়ে পাঠ্যতালিকার বাইরে সুনীলের পড়াশুনো নিতান্ত কম ছিল না। ওর সঙ্গে আলাপ করলে নামকরা ছাত্রী সুনন্দা খুশীই হত। কিন্তু তার সুযোগ হয়নি। সুনীল আর সুনন্দা নামেই শুধু এক শ্রেণীর। আসলে ওদের মধ্যে অনেক ধাপের ব্যবধান। আর্থিক অবস্থার, সামাজিক মর্যাদার। তাছাড়া আমাদের ছোট শহরে সে যুগে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মেলামেশা কেউ ভালো চোখে দেখতেন না। তা নিয়ে নিন্দামন্দ আলোচনা-সমালোচনা হত। তাই বলে যে মাঝে মাঝে কেলেঙ্কারি কান্ড ঘটত না তা নয়। পিছন দিয়ে হাতী যেত সামনে দিয়ে ছুঁচো যেতে পারত না।

দুজনে একই ক্লাসে পড়ে, একই প্রফেসরদের লেকচার শোনে, নোট নেয়, রোজ তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়, সুনীল তবু সুনন্দাকে দেড় বছরের মধ্যে একটি কথাও বলতে পারল না। তাদের মধ্যে যে কয়েক গজ ব্যবধান ছিল, তাই রয়ে গেল। কয়েক গজ তো নয় যেন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। মাঝখানে কয়েকখানি বেঞ্চ তো নয়, সাত সমুদ্র তের নদী।

টেস্ট আসন্ন। আড্ডা ছেড়ে পরীক্ষার ভয়ে আমরা বই মানে নোটবই নিয়ে উপুড় হয়ে পড়লাম। একদিন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, সুনীল একটি নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে পথের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে আছে।

আমি বললাম, 'একি তুমি এখানে একা একা কী করছ?'

সুনীল বলল, 'ঢেউ গুনছি।'

একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। বুঝতে পারলাম সুনীল আলাপ করতে চায় না। নিজের মধ্যে নিজেকে ও আরো গুটিয়ে নিয়েছে।

ফিরে এসে নির্মলকে সব বললাম। হোস্টেলে ও আমার রুমমেট। নির্মল বলল, 'সেরেছে। গরীবের ছেলেকে পেত্নীতে পেয়েছে। ওকে হাত ধরে তুলে আনলেই পারতে। জলে ডুবে টুবে না মরে।'

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে কোন্ এক শিল্পী গোপনে গোপনে চকখড়ি দিয়ে একটি পার্ক এঁকে ফেলল। নীচে সুরম্য উদ্যানটির নাম লেখা আছে—সু স্কোয়ার।

আমরা চেয়ে দেখলাম সুনন্দার বেঞ্চের আর চারটি মেয়ের মুখে চাপা হাসি। কিন্তু সুনন্দার মুখ থম থম করছে, চোখে অগ্নিবৃষ্টি।

দর্শনের প্রফেসর এসে সব দেখলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, 'তোমরা কি সব ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টস না কি ফোর্থ ক্লাসের?'

প্রফেসর চকখড়ির সেই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেললেন। কিন্তু ক্লাসের ছেলেদের ঠোঁটের হাসি আর চোখের বিদ্যুৎ কি অত সহজে মোছে?

এর দিন কয়েক পরে আর এক দুর্ঘটনা। সুনীল একটি সনেট লিখে কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপতে দিয়েছিল। কিন্তু কবিতাটি ছাপা হয়নি। বাংলার প্রফেসর বলেছেন ও কবিতা ছাত্রদের কাগজে ছাপবার যোগ্য নয়। মানে কোন ছাত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা।

নির্মলের অসাধ্য কাজ নেই। ম্যাগাজিনে আমাদের ছাত্রদের প্রতিনিধি ছিল নিত্যানন্দ মুখুজ্যে। তাকে কীভাবে বশ করে সেই কবিতাটি নির্মল উদ্ধার করল। তারপর আঠা দিয়ে এঁটে কলেজের দেয়ালে লাগিয়ে দিল। সারা কলেজ ভেঙে পড়ল সেই প্রথম প্রাচীরপত্র পড়বার জন্যে।

রাগে লাল টকটক করতে লাগল সুনন্দার মুখ। সে সরাসরি এসে সুনীলের মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কবিতা আপনি লিখেছেন?'

সুনীল বলল, 'আমি লিখেছি কিন্তু আমি ওখানে টাঙাইনি।'

সাবজজের বেটী পুরো জজের গলায় ধমক দিল, 'আপনি লিখেছেন কিনা তাই বলুন।'

আসামী বলল, 'হ্যাঁ লিখেছি।'

সুনন্দা রায় দিল, 'You should be ashamed'.

মৃত্যুদণ্ডের মতই কথাটা উচ্চারণ করল সুনন্দা।

আমি সে কবিতা পড়েছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত মুখস্থ ছিল। এখন ভুলে গেছি। সে কবিতায় দোষের কিছু ছিল না। অশ্লীলতা তো ছিলই না। না তখনকার স্ট্যান্ডার্ডে না এখনকার। সুনন্দার গন্ধ এক আধটু থাকলেও নাম ছিল না।

তবু প্রিন্সিপ্যাল সুনীলকে ডেকে বহিষ্কারের ভয় দেখালেন। নির্মলও দুচারটে ধমক খেল। কিন্তু ওর মত বকাটে ছেলেকে শাসন করবে কে? নির্মল বাইরে এসে প্রিন্সিপ্যালের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ল। তারপর ধীরে সুস্থে গিয়ে টেস্ট দিতে বসল।

কিন্তু পরীক্ষা দিতে এল না সুনীল। টেস্ট শেষ হওয়ার আগেই আমরা শুনতে পেলাম ও বইপত্র ছিঁড়ে চেয়ার টেবিল ভেঙে একাকার করেছে। আর অমন শান্তশিষ্ট মুখচোরা ছেলের মুখ থেকে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মত অশ্রাব্য অশ্লীল কথা সব বেরিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে সুনন্দার নাম। একেবারে উদ্দাম পাগল। শেষ পর্যন্ত ওকে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছে। কিন্তু মুখে তো আর কড়া পরানো যায় না।

শহরভরে ঢি ঢি পড়ে গেল। হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তুরেণ্টে কোর্টের সামনে স্টীমারঘাটায় সর্বত্রই এই আলোচনা।

সুনন্দা টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় এল। ওর বাবা চেষ্টাচরিত্র করে আলীপুরে বদলি হলেন।

কিন্তু সুনন্দা চলে গেলেও আমাদের জ্বালা সহজে গেল না। আমাদের ক্লাসেরই একটি ছেলে ওর জন্যে পাগল হয়ে গেল। এ লজ্জা, এ লাঞ্ছনা যেন আমাদের প্রত্যেকের। সুনন্দা যেন গোটা পুরুষ জাতটাকে জব্দ করে দিয়ে চলে গেছে।

সুনীলের বাবা মা প্রথমে নিজেদের কাছে রেখে কবিরাজী মতে ছেলের চিকিৎসা করালেন। কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত ওকে রাঁচী পাঠাতে হল। এখনো সুনীল রাঁচীতেই আছে।

আমি কোনদিন রাঁচী যাইনি, কিন্তু নির্মল কয়েকবার গেছে। সুনীলকে দেখে এসেছে। ওর সেই উদ্দামতা আর নেই। বেশি কথাও আর বলে না। আগের মতই চুপচাপ থাকে। তবে আগে গারদে ছিল না, এখন গারদে

থাকতে হয়। আর সতর্ক পাহারায় এক পাল পাগলের সঙ্গে বাস করে। কিন্তু আর কারো অস্তিত্ব কি সুনীলের কাছে আছে? আমার তো মনে হয় না। আমাদের এই মাতৃভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডার থেকে সুনীল শুধু তিন-চারটি শব্দ বেছে নিয়েছে। 'সুনন্দা তুমি আমার, তুমি আমার।' পৃথিবীর আর কোন ভাষার কোন শব্দে তার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয় কোন বাক্য সে জানে না। জীবনের একটি ভাব প্রকাশ করবার জন্যে একটি বাক্যই যথেষ্ট।

নির্মল আমাকে বলেছিল, 'তরণী সেনের কাটা মুণ্ড যেমন শুধু রাম নাম বলতে বলতে গড়াগড়ি গিয়েছিল আমাদের সুনীলেরও তেমনি হয়েছে। ওর বিকৃত মস্তিষ্ক শুধু একটি নাম মনে করে রেখেছে। ওর মুখ থেকে মনের সেই একটি মাত্র কথাই দিনরাত বেরোয়। ভাই মণি, ওকে দেখে আমার মনে হল পাগল না হলে ভালোবাসা যায় না। ভালোবেসে পাগল না হলে তাকে চিরস্থায়ী করা যায় না।'

পুলিসে এখন ভালো চাকরি করে নির্মল। বড় অফিসারই হয়েছে। সুখে শান্তিতেই আছে। তবু কিছুদিন আগেও এক লেডী টাইপিস্টকে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি হয়েছিল। সেই উপলক্ষেই ওসব কথা ওঠে। নির্মল বলেছিল, 'মণি, নিষ্ঠা বোধ হয় শুধু পাগলের মধ্যেই সম্ভব। নিষ্ঠা হারাবার অনেক জ্বালা, অনেক ঝামেলা। আমার পাগল হতে ইচ্ছে করে।'

আর সব দিক থেকে নির্মল খুব ভদ্র, খুব সহৃদয়। সুনীলের একটি ভাইকে ও ভালো চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সাধ্যমত দেখাশোনা উপকার সকলেরই ও করে। ধারটার চাইলে পারতপক্ষে বিমুখ করে না।

সুনন্দার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে রেখে আমরা কারো কারো কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, আর মনে না রেখে গোটা জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হই।

ভুলেই গিয়েছিলাম সুনন্দার কথা। হঠাৎ সেদিন দমদমে আমাদের কলোনীর গার্লস স্কুলে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্কুলের ফাউণ্ডেশন ডে-তে নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়ে গেলাম। আমার মেয়ে ওই স্কুলের ছাত্রী। আশ্চর্য, সুনন্দা সেন আমাদের স্কুলের নতুন হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছে।

সেক্রেটারী আমাকে চিনতেন। আমাদের ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউণ্ট আছে। দরকার পড়লে তাঁর কাজটাজ করে দিই। তিনি হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। না দিলে চট করে সুনন্দাকে চেনা শক্ত হত। আমার মত এত বিপুল না হলেও সেও স্থূলাঙ্গী হয়েছে। যে দক্ষ কারিগর বাটালি দিয়ে ওর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঁদে বের করেছিলেন, সুনন্দার এই মেদস্ফীতি

দেখে তিনিও কি চিনতে পারতেন? সেই অবয়ব, সেই রূপ, সেই লাবণ্য আর নেই। সমস্ত তীক্ষ্ণতার ওপর কাল তার স্থূল হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

সুনন্দাও আমাকে চিনেছিল। নমস্কার-বিনিময়ের পর মৃদু হেসে বিদায় নিল। ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত। অন্য টিচারদের ছাত্রীদের নির্দেশ দিচ্ছে। এরই মধ্যে আবার ফাঁকে ফাঁকে বিশিষ্ট অতিথিদের স্মিতমুখে আপ্যায়ন করছে। আমি এককোণে অতিথিদের সামনে বসে দেখতে লাগলাম ওর সেই ব্যস্ততার রূপ।

পরনে লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি। এমন কিছু দামী শাড়ি নয়। হাতে দুগাছি সরু চুড়ি আর একটি ছোট ঘড়ি, যার দিকে সুনন্দা বারবার তাকাচ্ছিল। সেই সাবজজ-দুহিতা তখনকার আভরণ অলঙ্করণের সব আতিশয্য থেকে মুক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করলাম সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কিন্তু আজকাল তো হিন্দু সমাজের অনেক বিবাহিতাও সিঁদুর পরেন না।

অবশ্য একটু বাদেই সেক্রেটারী আমার সমস্ত সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'মিস সেনের মত এমন চমৎকার হেডমিস্ট্রেস তিনি আর জীবনে দেখেননি। যেমন মিষ্টি স্বভাব তেমনি অমায়িক ব্যবহার, কাজেকর্মে তেমনি নৈপুণ্য। স্কুলটা এতদিন পরে ভালো হাতে পড়ল।'

সেদিন আর কোন কথা হল না। কিন্তু দুদিন পরে সুনন্দা সেন আমাকে তার কোয়ার্টারে চায়ের নিমন্ত্রণ করল। আমি তো অবাক! নিমন্ত্রিত হবার মত ঘনিষ্ঠতা তো আমাদের মধ্যে ছিল না।

আমার স্ত্রী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমি একাই গেলাম। ছোট্ট বাড়ি। বিশেষ লোকজন নেই। সুনন্দা ওর এক ভাইপোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

পিসীর ক্লাসফ্রেন্ড সম্বন্ধে ভাইপোর কোন ঔৎসুক্যের পরিচয় পেলাম না। সে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার ঔদাসীন্যের ক্ষতিপূরণ করল সুনন্দা নিজে। সে নিজের হাতে খাবার আনল, চা করে আনল। এক কাপ চা নিয়ে নিজেও বসল একটা চেয়ার টেনে। সেই দুস্তর ব্যবধান আর নেই। মাঝখানে ছোট একটি গোল টেবিল। সবুজ ফুল-তোলা সাদা ঢাকনিতে ঢাকা।

সূর্যাস্তের নরম মৃদু আলোয় আমার মনে হল ওর মুখে ফের এক অপূর্ব মহিমার ছাপ লেগেছে। বয়স সুনন্দার অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, আবার অনেক কিছু ধরেও দিয়েছে।

আমরা দেশের অবস্থা, উদ্বাস্তু-সমস্যা, আধুনিক শিক্ষাবিধি নিয়ে আলোচনা করলাম। কিছু কিছু রাজনীতির কথাও উঠল।

তারপর দু'জনে চুপ করে বসে রইলাম।

সুনন্দা একবার বলল, 'আপনাকে আর এক কাপ চা দিই?'

আমি বললাম, 'দিন।'

তারপর আমরা অনেকক্ষণ আর কোন কথা বললাম না। আমার মনে অনেক প্রশ্নই ভিড় করে এসেছিলঃ 'সুনীলের সঙ্গে কি ফের তোমার দেখা হয়েছে? দেখতে গিয়েছিলে? সামনে যাবার সাহস ছিল? না আড়ালে ভীরুর মত দুরু দুরু বুকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে? তুমি বিয়ে করোনি কেন? এ কি প্রেম না অনুতাপ আর অনুকম্পা?'

কিন্তু একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। আমি তো আর নির্মলের মত পুলিস অফিসার নই যে জেরায় জেরায় সব টেনে বার করব। নির্মল হলে পারত।

সুনন্দাও ওসব প্রসঙ্গের ধার দিয়ে গেল না বরং সন্তর্পণে সব পাশ কাটিয়ে গেল। বুঝতে পেরে আমি আরো দূরে দূরে হাঁটলাম। ভদ্রমহিলার সঙ্গে অভদ্রতা তো আর করতে পারিনে।

আস্তে আস্তে ঘরে সন্ধ্যার ছায়া পড়ল। সুনন্দা আলো জ্বালতে ভুলে গেল কি আলো জ্বালতে ওর ইচ্ছা হল না জানি না।

সেই গভীর নীরবতায়, সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে আমি অনুভব করলাম সুনন্দা সব জানে। আর অনুভব করলাম আমি সুনীলের প্রতিনিধি।"

কাহিনী শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মণিমোহন।

তাঁর এঞ্জিনিয়ার বন্ধুও কোন কথা বললেন না। একটু বাদে মণিমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলি ভাই, অনেক দূর যেতে হবে। তাহলে ছেলেটার জন্যে একটু চেষ্টা কোরো।'

॥ শাল ॥

রাত্রে অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরি অনিমেষ। সবে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, তবু এরই মধ্যে বেশ খানিকটা শীত পড়েছে। কিন্তু শীতবস্ত্র এখনও কিছু আসেনি। পাঞ্জাবির ওপর শুধু একটা পুল-ওভার ভরসা। কিন্তু একটা কিছু গায়ে না জড়াতে পারলে যেন কিছুতেই আজ আর শীত মানবে না। অনিমেষ ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বিছানার ওপর থেকে রঙীন সুজনিটা তুলে নিল।

বীথিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল স্বামীর কাণ্ড। বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে!'

অনিমেষ বলল, 'হবে আবার কি। আজকের রাত্রের মত এই সুজনিই আমার অঙ্গাবরণ। দেখ তো কি রকম মানিয়েছে।'

বীথিকা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে রাজবেশ। ছাড়। ওটা নিয়ে তোমাকে কিছুতেই আমি বেরুতে দেব না। মানুষের একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে তো।'

এগিয়ে এসে সত্যিই সুজনিটা স্বামীর গা থেকে খুলে নিল বীথিকা।

অনিমেষ বলল, 'বেশ, তাহলে ভাণ্ডার খোল, হাতড়ে হাতড়ে দেখ, কোন কিছু মেলে নাকি। অন্তত একটা মাফলার টাফলার গলায় জড়িয়ে যেতে পারলেও হয়।'

বীথিকা অভিযোগের সুরে বলল, 'এত ক'রে বলি, রাত্রে যখন প্রতি মাসেই একবার ক'রে বেরুতে হয়, তোমার যা দরকার আগে করে নাও। অন্তত একটা সার্জের পাঞ্জাবি থাকলেও তো হয়। কিন্তু করবার সময় কিছু করবে না, আর বেরুবার সময় বিছানা লেপ বালিস তোষক যা পাও তাই নিয়ে টানাটানি করবে।'

স্ত্রীর গঞ্জনাটা বিনা প্রতিবাদে শুনতে লাগল অনিমেষ। এ কথা বলল না যে, করবার ইচ্ছা থাকলেই সব জিনিস করা যায় না। বাংলা দৈনিক কাগজের অফিসে চাকরি। মাইনে স্বল্প, তাও সুনিয়মিত নয়। যা মেলে তাতে খোরাক আর পোষাক দুইই একসঙ্গে সংগ্রহ করা হয়ে ওঠে না। তবু তো মাইনে পেয়েই এ মাসে এক জোড়া শাড়ি আর বাবুলের জন্য গরম জামা মোজা কিনে আনতে হয়েছে। কিন্তু বীথিকার ভঙ্গিটুকু ভারি উপভোগ্য। যেন গাফিলতি ক'রেই জিনিসপত্র কিছু করে না অনিমেষ। কেবল স্বামীর

কাছে নয়, প্রতিবেশীদের কাছেও এই ভাবটাই বীথিকা বজায় রাখতে চায়। ঘরের দরকারী জিনিসপত্রের অপ্রতুলতার কারণ অর্থাভাব নয়, অনিমেষের অমনোযোগ আর ঔদাসীন্য।

অনিমেষ বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু বীথিকা ফের বাধা দিল, 'দাঁড়াও, দেখি কিছু আছে নাকি, খালি গায়ে বেরিয়ে বেরিয়ে তুমি একটা শক্ত রকমের কিছু অসুখ বিসুখ না ঘটিয়ে তো আর ছাড়বে না। এত ক'রে বললাম আমার শাড়ি সামনের মাসে হবে, তুমি একটা র‍্যাপার ট্যাপার কিনে নাও আগে। বাবুলেরও পুরনো যা ছিল এ মাস তাতেই চলত, ওর তো আর তোমার মত নাইট ডিউটি নেই।'

দু'বছরের ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ একটু হাসল, তারপর স্ত্রীকে বলল, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাজভাণ্ডার একবার উপুড় করবে তো কর, আর না হলে চলি।'

ছোট ছোট গোটা দুই স্যুটকেস, আর বীথিকার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া বড় একটা ট্রাঙ্কের স্থান রয়েছে তক্তপোশের তলায়। নিচু হয়ে একটু হামাগুড়ি দিয়ে সেই ট্রাঙ্কটা বীথিকা টেনে বার করল। তারপর স্বামীকে বলল 'তাকের উপর বার্লির খালি কৌটোটার মধ্যে চাবির রিং রেখেছি, দাও দেখি।'

তাকে বার্লির কৌটো একটা নয়। একটার মুখ খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে চিনি, আর একটার মধ্যে মসলা। তৃতীয় কৌটোটায় হাত দিতে যাচ্ছিল অনিমেষ, বীথিকা এগিয়ে এসে তার পাশের কৌটোর 'মুঠকি' খুলে চাবির রিংটা বের করে নিতে নিতে বলল, 'কোন কাজ যদি হয়, তোমাকে দিয়ে।'

অনিমেষ বলল, 'বা রে, তুমি কোথায় কোন জিনিস লুকিয়ে রাখ, আমি পাব কি করে!'

ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে নানা জিনিস বেরুতে লাগল। পুরনো ছেঁড়া ধুতি পাঞ্জাবি, বীথিকার খান দুই পোষাকী শাড়ি, বাবুলের খেলনা, একখণ্ড গীত-বিতান, কিন্তু শীতবস্ত্রের সাক্ষাৎ নেই।

অনিমেষ সরে এসে বলল, 'থাক্ থাক্ হয়েছে।' কিন্তু বীথিকা বলল, 'না, পেয়েছি, আমার প্রাণটা আঁৎকে উঠেছিল, গেল কোথায় জিনিসটা। এই নাও।'

অনিমেষ বিস্মিত হয়ে দেখল বীথিকার হাতে একখানা কাশ্মীরী শাল। পুরনো কিন্তু দামী সৌখীন জিনিস।

একটু চুপ করে থেকে অনিমেষ বলল, 'এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? এ কার?'

বীথিকা একটু কাল মাথা নিচু করে রইল, তারপর স্বামীর দিকে না তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মার কাছে ছিল। বাবার একটা জরুরী দলিল খুঁজতে

খুঁজতে আমাদের সেই বড় আলমারীর দেরাজ থেকে বেরিয়েছে। মা বললেন, তোর জিনিস তুই নিয়ে যা।'

অনিমেষ বলল, 'তোর জিনিস মানে? ও, বিজয়ের—বিজয়বাবুর শাল বুঝি?'

বীথিকা অস্ফুট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর শালটা তক্তপোশের ওপর রেখে সমস্ত জিনিস ফের ট্রাংকের ভিতর ভরতে লাগল।

অনিমেষ বলল, 'ওটাও তুলে রাখলে পারতে।'

বীথিকা এবার স্বামীর দিকে তাকাল, 'কেন?'

অনিমেষ একটু থতমত খেয়ে বলল, 'মানে দামী জিনিস তো। সাধারণ ব্যবহারের জিনিস তো আর নয়।'

ততক্ষণে বীথিকা ট্রাঙ্ক বন্ধ করে ফেলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে শালখানার ভাঁজ ভেঙে স্বামীর কাঁধে রেখে দিয়ে বীথিকা একটু হেসে বলল 'সাধে কি আর তোমাকে কৃপণ বলি। জিনিস দামী বলে তা কি চিরকাল লোকে বাক্সে তুলে রাখে? ব্যবহার করে না? নাও।'

কথা বলবার ভঙ্গিটুকু বেশ মিষ্টি বীথিকার, আর হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওকে।

অনিমেষ আর আপত্তি করতে পারল না, বলল, 'আচ্ছা চলি।

তারপর চৌকাঠে পা দিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বেশ চমৎকার জিনিস সত্যি। বিজয়বাবু বেশ সৌখীন পুরুষ ছিলেন। আমার মত উজবুক ছিলেন না, কি বল বীথি?'

একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা বিজয়বাবু কত দিয়ে কিনেছিলেন শালটা? মনে আছে?'

বীথিকা বলল, 'তা জানি না। দাম টাম আমাকে বলত না। বন্ধুদের সঙ্গে একবার এলাহাবাদে গিয়েছি বেড়াতে। সেখান থেকে-।'

অনিমেষ বলল, 'ও, আচ্ছা চললুম। সাবধানে থেক।'

বীথিকা মৃদু হাসল, 'অসাবধানের কি আছে? ভালো কথা, বাবুলকে বুঝি তুমি কমলালেবুর লোভ দেখিয়েছিলে। বিকাল থেকে লেবু লেবু করছিল।'

অনিমেষ বলল, 'আচ্ছা, কাল নিয়ে আসব। আর বাবুলের মার বুঝি কোন কিছুতে লোভ নেই? একেবারে নিরাসক্ত যোগিনী?'

বীথিকা বলল, 'আহাহা! লোভ থাকলেই বা কি! লোভের বড় জিনিসটিকে ধরেই তো 'সুপ্রভাত' অফিস টান দিয়েছে।'

অনিমেষ বলল, 'তা ঠিক, নাইট ডিউটির রাতগুলি শুভ-রজনী নয়, কিন্তু ক' ঘণ্টা বিচ্ছেদের পর ভোরগুলি তো সত্যিই সুপ্রভাত।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ আর দাঁড়াল না। কিন্তু বাসে উঠে লক্ষ্য করল সহযাত্রীদের কেউ কেউ তার শালখানার দিকে একাধিকবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। অনিমেষ নিজেও আর একবার শালখানার দিকে চোখ ঘোরাল। সত্যি, ভারি দামী আর চমৎকার জিনিস। কিন্তু এর প্রথম অধিকারী আজ আর নেই। বীথিকার সঙ্গে বিজয়ের শালও আজ তার উত্তরাধিকারীর হাতে পড়েছে।

বিজয়ের সম্বন্ধে আরো দু'টুকরো তথ্য আজ জানল অনিমেষ। বন্ধুদের সঙ্গে এলাহাবাদ বেড়াতে গিয়ে শাল কিনেছিল। আর জিনিসপত্র কিনে স্ত্রীকে তার দাম বলবার মত অভ্যাস ছিল না বিজয়ের।

বিজয়ের সম্বন্ধে সত্যি বড় বেশি চুপচাপ বীথিকা। মাঝে মাঝে দু' একদিন কৌতূহলী হয়ে এক আধটা কথা জিজ্ঞেস করতে গেছে অনিমেষ, বীথিকার কাছ থেকে তেমন উৎসাহ পায়নি। পর মুহূর্তে নিজেই লজ্জিত হয়েছে। ছিঃ. কি দরকার এ সব কথা পেড়ে! স্ত্রীর বিগত স্বামী কেমন ছিল তা জানতে যাওয়া অভদ্রতা ছাড়া আর কি, এ যেন বিবাহিতা স্ত্রীর কুমারী জীবন সম্বন্ধে স্বামীর অশোভন অনুসন্ধিৎসা। না, তার চেয়েও নিষ্ঠুর কাজ। অবশ্য যতদূর জানা যায় বিজয়ের সঙ্গে মোটেই হৃদ্য সম্পর্ক ছিল না বীথিকার। বনি-বনাও ছিল না স্বামী-স্ত্রীর।

বীথিকা যে কুমারী নয়, অধ্যাপক শ্রীবিলাসবাবুর বাড়িতে প্রথম আলাপে অনিমেষ তা মোটেই বুঝতে পারেনি। কি করে বুঝবে। সাধারণ হিন্দুর ঘরে বেশে চালে চেহারায় বিধবার যে লক্ষণ সুনির্দিষ্ট তা বীথিকার মোটেই ছিল না। তখন থেকেই বিজয়ের স্মৃতিকে নতুন কৌমার্যে একেবারে যেন মুছে ফেলেছিল বীথিকা। পরনে ছিল অনতিপ্রশস্ত কালো-পেড়ে শাড়ি, হাতে একগাছা করে চুড়ি, গলায় সরু হার। বীথিকাকে কুমারী বলেই বহুদিন মনে ভ্রম ছিল অনিমেষের। খুব তাড়াতাড়ি সে ভুল ভাঙবার কেউ তখন চেষ্টা করেননি। না বীথিকার বাবা শ্রীবিলাসবাবু না তার মা মনোরমা। বীথিকাও অনিমেষের সঙ্গে আলাপ করেছে, গল্প করেছে, চায়ের আসরে সাহিত্য রাজনীতির তর্ক তুলেছে, কিন্তু কোনদিন বিজয়ের প্রসঙ্গ তোলেনি। তোলবার কোন অবকাশ ছিল না। আর সে অবকাশ যে হয়নি তার জন্য মনে মনে অনিমেষ কৃতজ্ঞ সকলের কাছে। রঙিন শাড়ি কেন বীথিকা পরে না এ প্রশ্ন অনিমেষের মনে একবারও ওঠেনি। কারণ শাড়ির রঙের অভাব মনের রঙে ভরে গিয়েছিল। আভরণের অপ্রাচুর্যকে মনে হয়েছিল রুচির স্বকীয়তা বলে।

তারপর আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে অনিমেষ অবশ্য সবই জানল। যখন জানল তখন আর পেছুনো যায় না, পিছুবার কথা ভাবতে গেলেও কষ্ট হয়। তা ছাড়া পিছিয়ে আসবার প্রয়োজনই বা কি! বিজয় মুখুজ্যে নামে আর একটি ছেলের সঙ্গে বীথিকার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে বছর তিনেক ছিল বেঁচে। তারপর কুচবিহার না কোথায় গিয়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় বেচারা মারা গেছে। স্বামীর সঙ্গে বীথিকার মনের মিল ছিল না। বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও তার বনেনি। ফিরে এসেছে অধ্যাপক বাপের কাছে। যে ছাত্রী-জীবনে ছেদ পড়েছিল ফের সংযোগ হয়েছে তার সঙ্গে। বীথিকার জীবনের এই ছোট অধ্যায়টুকু নগণ্য ক'টি তথ্য ছাড়া আর কি। তাই এ সব জেনেও একদিন মেঘলা বিকালে তেতলার ছাতের নিরালা চিলাকোঠায় অনিমেষ বীথিকার হাতখানা নিজের মুঠির ভিতরে অসঙ্কোচে তুলে নিতে পেরেছিল, 'আমি আজ জবাব চাই বীথিকা।'

বীথিকা হাত ছাড়িয়ে নেয়নি।

জবাবের বদলে মুখ নিচু করে আর একটি ছোট প্রশ্ন শুধু করেছিল, 'তুমি তো সবই শুনেছ। আমি কি তোমাকে সুখী করতে পারব?'

এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব অনিমেষ বিয়ের পর দিয়েছে। নিজেদের দাম্পত্য জীবনই এর যোগ্য জবাব। অবশ্য গোড়ায় ছোটখাট দু' একটি বাধা যে আসেনি তা নয়। বাবা মা নেই, দূর সম্পর্কের কাকার সমর্থন প্রারম্ভে পায়নি অনিমেষ। পরে তিনি একদিন এসে বউ দেখে গেছেন, অন্ন গ্রহণ করেননি। আর বীথিকার যে শ্বশুর বিধবা পুত্রবধূর গায়ের গয়না শুদ্ধ সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করে তার সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিয়েছিলেন, বিয়ের সংবাদে তিনিই আবার ছুটে এসেছিলেন উন্মত্তের মত! অনিমেষকে শাসিয়েছিলেন মামলা করবেন বলে। শেষে বোধ হয় উকিলের পরামর্শে বিরত হয়েছেন।

কিন্তু বাইরের ঝড়-ঝাপটায় দু'জনের নীড়ের কোন ক্ষতি হয়নি। বীথিকার মত মেয়ে হয় না। তার বাবা আর পূর্বতন স্বামীর তুলনায় আর্থিক দিক থেকে অনিমেষ যে অস্বচ্ছল তা সে জানে। কিন্তু তার জন্য বীথিকার মুখ কোন দিন ম্লান দেখা যায়নি, কোন দিন নিরুদ্যম হয়নি বীথিকা। অনিমেষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবকে নিপুণ মিতব্যয়িতায় বীথিকা আড়াল ক'রে রেখেছে। বন্ধুরা যে আসে সেই সুখ্যাতি করে। অনিমেষ শুধু সুন্দরী ভার্যার নয়, সুগৃহিণীর স্বামী।

অফিসে পৌঁছে অনিমেষ সিফ্‌ট ইনচার্জের চেয়ারে বসতে না বসতেই উল্টোদিকের চেয়ারে কান্তিময় একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠল, 'আরে ব্যাপার

কি অনিমেষ দা, করেছেন কি?' অনিমেষ ব্যাপারটা টের পেয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, 'করব আবার কি!' কান্তিময় বলল, 'করবেন আবার কি মানে। এই শীতের রাতে এর চেয়ে বড় এ্যাচিভমেণ্ট আর কে করতে পেরেছে? রাতারাতি এমন সলভেণ্ট হলেন কি করে? এ তো দাদা সাদা বাজারের সাধ্য নয়, একেবারে কুচকুচে কালো বাজার।'

কান্তিময় অনিমেষের কাঁধ থেকে শালখানা নিজের হাতে তুলে নিল, তার পর বলল, 'বাঃ, চমৎকার জিনিস।'

সংবাদ অনুবাদ ফেলে রেখে অন্যান্য সহকর্মীরা ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে। কার্তিক, গৌতম, সুধীন, প্রফুল্ল প্রত্যেকের হাত থেকে হাতে ফিরছে শাল।

'কত দিয়ে কিনলেন অনিমেষবাবু?'

অনিমেষ পরিবেশনযোগ্য সংবাদ বাছাইয়ের কাজে মন দিতে দিতে বলল, 'কেনা নয়, পুরনো জিনিস, দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

কান্তিময় একটু সুর সংযোগে বলল, 'কে বলে পুরনো হতে নতুন উত্তম। নতুন জ্বরে মাথা ধরে, বিশ্বাস নেই নতুন চাকরে—। সংসারে চিরকাল apprentice-এর চাইতে experienced hand-এর দাম বেশি।'

অনিমেষ ধমকের ভঙ্গিতে বলল 'হয়েছে, এবার কপি ছাড়তে সুরু কর তো। প্রেসের লোক এসে এক্ষুণি তাড়া লাগাবে।'

সুধীন শালখানা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ও তাই বলুন অনিমেষবাবু। স্বোপার্জন নয়, উত্তরাধিকার।'

গৌতম হেসে বলল, 'আরে ভাই সেও তো অর্জন। এমন উত্তরাধিকারের ভাগ্যই বা অনিমেষের মত কজনের হয়।'

অনিমেষ ওদের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারল সহকর্মীদের মধ্যে যারা ব্যাপারটা জানে তাদের সবাই মুখ টিপে হাসছে। শালখানা যে বিজয়ের তা অবশ্য অনিমেষ কাউকে বলেনি, কিন্তু তার কেমন যেন মনে হতে লাগল ওরা সবাই টের পেয়েছে। টের পেলেই বা কি? একজনের জিনিস কি আর-একজনে ব্যবহার করে না? মৃত আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহৃত জিনিস যদি ভোগ করা চলে, স্ত্রীর বিগত, মৃত স্বামীর একখানা শাল গায়ে দিতেই বা লজ্জা কিসের? তবু অযৌক্তিক কুণ্ঠাটা যেতে চায় না; কোথায় যেন একটু হীনতা আছে এর মধ্যে, আছে নিজের দারিদ্র্যের অগৌরব। কিন্তু রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বেশ জোর পড়ল। সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে শালটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে বসে দ্রুত কলম চালাতে লাগল অনিমেষ।

প্রেসের নাইট ইনচার্জকে যথারীতি উপদেশ দিয়ে শুতে শুতে রাত প্রায় তিনটা বাজল অনিমেষের। অন্যান্য সহকর্মীরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দু'খানা টেবিল জোড়া দিয়ে তার ওপর কম্বল বিছিয়ে অনিমেষের জন্য শয্যা রচনা করে রেখেছে বেয়ারা বৈকুণ্ঠ। মোটা মোটা তিনখণ্ড ডিক্সনারীকে উপাধান ক'রে শালটাকে র‍্যাগের মত ব্যবহার করল অনিমেষ। পায়ের নখ থেকে চিবুক পর্যন্ত ঢাকল, ঠোঁট দুটি অনাবৃত রাখল সিগারেটের জন্য। ঘুমুবার আগে আর একবার মনে পড়ল বীথিকার মুখ। কিন্তু জেগে থেকে ওর ঘুমন্ত মুখ দেখতে আরো সুন্দর।

পরদিন ভোরে বেশ একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল অনিমেষের। অনেক রোদ উঠে গেছে। বেলা সাতটা। অন্যান্য দিন আরো সকালে ওঠে। অনিমেষ বাসায় না পেঁৗছা পর্যন্ত কিছুতেই চা খায় না বীথিকা। এত ক'রে বলেছে অনিমেষ, তবু না। ওর ওই এক দোষ। বলে 'একা একা চা খেতে ভালো লাগে না।' অনিমেষ জবাব দেয়, 'প্রথম কাপ না হয় একাই খেলে, দ্বিতীয় কাপ দুজনে খাওয়া যাবে!' কিন্তু সকালে প্রথম কাপই শেষ কাপ বীথিকার, দ্বিতীয় কাপ ওর সন্ধ্যার জন্য থাকে।

বাস-স্ট্যাণ্ডের সামনেই ফল আর রুটির দোকান। বাবুলের কমলালেবুর আবদারের কথা অনিমেষের মনে পড়ল। একটু দগ্ধ দাম ক'রে লেবু কিনল দুটো। আর একজনের আরও একটু আবদার আছে। কিন্তু তা একেবারে অপ্রকাশিত। চায়ের সঙ্গে আটার রুটির চাইতে পাঁউরুটি খেতে ভালোবাসে বীথিকা। কিন্তু তা তো কোনদিন মুখ ফুটে বলবে না। এসব ব্যাপারে চিরকালই ভারি লাজুক। কুপন সঙ্গে নেই। দু'চার পয়সা বেশি দিয়েই ফিরপোর কোয়ার্টার পাউণ্ড নিল অনিমেষ। পকেটে হাত দিয়ে দেখল বাস ভাড়ার আনিটা ঠিকই আছে।

বাসায় এসে অনিমেষ দেখল স্নান সেরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বীথিকা তার জন্য অপেক্ষা করছে! ভিজে চুলে পিঠ ঢাকা। সিঁথি আর কপালে সিঁদুরের সুন্দর প্রসাধন। এ সিঁদুর ক বছর আগে আর একজনের জন্য পরত বীথিকা. সে মুছেও দিয়ে গিয়েছিল তা কি এখনও ওর মনে আছে? মনে পড়ে সিঁদুর পরবার সময়? নিশ্চয়ই না। কিন্তু ছিঃ, এসব কি ভাবছে অনিমেষ? এসব শুধু অভদ্রতা নয়, নিষ্ঠুরতা। নিজের ওপরই অনিমেষ যেন একটু রুষ্ট হয়ে উঠল।

ততক্ষণে স্বামীকে দেখে মাথায় অল্প একটু আঁচল তুলে দিয়েছে বীথিকা। ফিকে হলদে রঙের আঁচল। খুব ফর্সা রঙ বীথিকার। ফলে যে কোন রঙের শাড়িই ওকে মানায়। তবু শাড়ি কিনতে গিয়ে রঙ বাছাই করতে অনেক সময় নেয় অনিমেষ। এক রঙের পর আর এক রঙ। কোন দিন ভুলেও আনে না কালো পাড় কি সাদা খোলের শাড়ি।

অনিমেষ স্মিতমুখে হাতের কাগজখানা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'সুপ্রভাত।'

বীথিকা ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'সুপ্রভাত নয়, বিলম্বিত প্রভাত বল। আজ এত দেরি যে।'

অনিমেষ বলল, 'তোমার শালের দোষ। কাল রাতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়েছে, এমন কোন দিন হয় না। একেবারে অতুলনীয় শীতবস্ত্র। সব কাজে লাগে।'

শীতের পোষাকে ছোট্ট সাহেব বাবুল এসে কোল ঘেঁসে দাঁড়াল, 'বাবন, কমলা।'

পকেট থেকে কমলা বের করে ছেলের দুহাতে তুলে দিল অনিমেষ, তারপর অয়েল পেপারে মোড়া রুটিটা এগিয়ে দিল স্ত্রীর দিকে। বীথিকা আরক্ত হয়ে বলল, 'ফের রুটি? তুমি বড় অপব্যয়ী হয়েছ আজকাল।'

অনিমেষ মৃদু হাসল, এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'নাও, রাখো এবার তোমার শাল। সবাই বলছিল, আমাকে নাকি বেশ মানিয়েছে। সত্যি?'

বীথিকা স্মিতমুখে বলল, 'তোমাকে কি না মানায়।'

তারপর স্বামীর কাঁধ থেকে শালটা নামাতে নামাতে হঠাৎ মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদের সুরে বীথিকা বলে উঠল, 'একি?'

অনিমেষ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হ'ল?' শালের একটা কোনা অনিমেষের সামনে মেলে ধরে বীথিকা তীব্র অভিযোগের স্বরে বলল, 'এ দশা হ'ল কি করে?'

এতক্ষণে বুঝতে পারল অনিমেষ। একটু চুপ করে থেকে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'ও। কিন্তু ফুটোটা বোধহয় আগেই ছিল।'

বীথিকা বলল, 'মিথ্যে কথা। সে কখনো সিগারেট খেত না।'

বিজয়ের সম্বন্ধে আর একটি তথ্য। সে সিগারেট খেয়ে কোন দিন গায়ের শাল পোড়ায়নি। কিন্তু এ কি কেবল তথ্যই? বীথিকার আর্তস্বর, তার অভিযোগের তীব্রতা শুধু কি একটুকরো তথ্যকেই প্রকাশ করেছে?

সিগারেটের আগুনে পোড়া শালের ছোট একটু ছিদ্র। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে দুজনের কাছে কি দুটি অদৃষ্টপূর্ব জগতই না উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মাত্র একবার এক পলকের জন্য দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু একটি পলে যেন একটি যুগের ব্যাপ্তি, যুগান্তরের ঝড়। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শালটা তক্তপোশের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বীথিকা। আর নিঃশব্দে জামা কাপড় খুলে অনিমেষ ঢুকল বাথ রুমে।

মিনিট পনের কুড়ি বাদেই অবশ্য চায়ের কাপ আর প্লেট ভরা টোস্ট নিয়ে

অন্যান্য দিনের মতই ফের দুজনে বসল মুখোমুখি। লোভী বাবুল কমলা রেখে টোস্টের জন্য হাত বাড়াল। একখানা দিলে চলবে না। বাবাও দেবে মাও দেবে। বীথিকা হেসে ফেলল। অনিমেষও হাসল, 'ঘটোৎকচ'।

তবু দিনটা ঠিক অন্যান্য দিনের মত লাগল না। মুখ নিচু করে চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বীথিকা এক সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মাফ কর।'

অনিমেষ চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে স্নিগ্ধ একটু হাসল, 'পাগল।'

বীথিকার আনত মুখ লজ্জার আভায় আরক্ত।

আঁজলা ভরে ঠাণ্ডা জল ছিটাবার পর অনিমেষের দু' চোখে সেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গও এখন আর নেই। তার বদলে শুধু অনুকম্পা। নিজের জন্য খানিকটা লজ্জাও। তুচ্ছ কারণে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হয়ে গেছে। নিজের আচরণে বিস্মিত হয়েছে অনিমেষ, কিন্তু তার চেয়েও বড় বিস্ময় বীথিকা। সব ভুলে সব বিলিয়ে দিয়েও একখানা শাল সে আজও অক্ষত নিশ্ছিদ্র রাখতে চায়। মনে রাখতে চায় কে একজন সিগারেট খেত না। শতছিদ্র স্মৃতির ভাণ্ডারে তার এখনো এ কি স্বর্ণরেণু সঞ্চয়ের সাধ!

॥ ব ন্দি নী ॥

নানা বয়সী মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চায় ছোট লেডীজ পার্কটা ভরে গেছে। তবু কোনরকমে একটি বেঞ্চ দখল করে বসে দুই সখী সারা বিকেল ধরে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল। দুজনে কলেজে একসঙ্গে পড়ত। অনসূয়া রায় বছর দুই হল বি এ পাস করে সরকারী অফিসে ঢুকেছে। শ্রীলেখা ঘোষালও পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু পাস করতে পারেনি। তবে রেজাল্ট বেরোবার আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বামীকে সহায় করে সে আরো একবার পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু একই ফল। মানে একই রকমের বিফলতা। শ্রীলেখার সঙ্কল্প সে আরো একবার পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তার স্বামীর তাতে সায় নেই। অরুণ নাকি বলেছে 'এ অবস্থায় রিস্ক না নেওয়াই ভালো। মাস চারেক পরেই তো তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।' বন্ধুর পরিপুষ্ট দেহের দিকে চেয়ে অনসূয়া একটু হাসল, 'আমিও তাই বলি। তোর কাজ নেই আর ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে। বেশ তো আছিস। সংসারের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ-র পর এম এ ডিগ্রী নিতে যাচ্ছিস। তোর আর ভাবনা কি।'

অনসূয়ার হাসি, কথা আর তাকাবার মানে বুঝতে পেরে শ্রীলেখা একটু লজ্জিত হল। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে একটু টেনে বসল, তারপর বন্ধুকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। তুই কেবল আমার সুখটাই দেখলি, দুঃখটা বুঝতে পারলিনে। যাই বলিস, আজকালকার মেয়েদের স্বামী-সংসার একদিকে আর নিজের ক্যারিয়ার একদিকে। তুই নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করে নিয়েছিস।'

অনসূয়া বলল, 'ছাই ক্যারিয়ার। কেরানীগিরি আবার একটা ক্যারিয়ার নাকি। তাও তো এবার স্ট্রাইকের জন্যে যেতে বসেছিল।'

শ্রীলেখা বলল 'যাই হোক, ঝামেলা তো মিটে গেছে। চাকরিতে তোর প্রসপেক্ট আছে। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে চাই কি তুই অফিসার গ্রেডে চলে যেতে পারিস। আমি খাঁচার পাখি। পড়াশুনো যদি না হয় আমার যা হবার হয়ে গেল। আর তুই মুক্ত পাখি। অফিসের ওই সময়টুকু ছাড়া তুই যেখানে খুশি উড়ে বেড়াতে পারিস।'

অনসূয়া বলল, 'উড়ে বেড়াবার জ্বালা আছে রে। ব্যাধ তীর-ধনু হাতে পিছনে পিছনে লেগেই আছে। তীরের ডগায় বিঁধে যে কোন মুহূর্তে ধুলোর মধ্যে কাদার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।'

শ্রীলেখা আরও ঘন হয়ে বসে সখীর চিবুক তুলে ধরল, 'আহাহা, কি সুখের ভয় রে। ধুলোয় ফেলবে কেন, পুষ্পশরে যারা বেঁধে রক্তাক্ত পাখিকে তারা বুকেই তুলে নেয়। তারপর—' শ্রীলেখা এবার অনসূয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে আদর করে। পাখি ছাড়া ব্যাধেরও তো দুটি ঠোঁট আছে।'

মুখ সরিয়ে এনে শ্রীলেখা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'বল না অনু, সে ব্যাধ তোর কোথায়। অফিসে না অফিসের বাইরে।'

অনসূয়া বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে বলল, 'তুই যা ভাবছিস তা নয়। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তোকে আর একদিন বলব।'

শ্রীলেখা ভাবল অনসূয়া বড় চাপা মেয়ে। দু'বছর একসঙ্গে পড়ে সে ওকে চিনেছে। যারা বুদ্ধিমতী তারা বোধ হয় চাপাই হয়। শুধু বুদ্ধিমতী নয়, অনসূয়া সুন্দরীও। কালোর ওপর সুশ্রী ছিপছিপে চেহারা। টানা নাক-চোখ। বলতে কইতে পারে। ওকে ভালোবাসার জন্যে ছেলেরা পাগল হবে না কেন। শ্রীলেখা সুন্দরী নয়। রং ফর্সা হলেও বেঁটে মোটা। তারপর আবার মুখচোরা। তাই দায় হিসাবে বাপের ঘাড়ে পড়েছিল। তিনি প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা দেনা করে মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন। শ্রীলেখার ভারি লজ্জা হয় এজন্যে। অনসূয়াকে এ লজ্জা পেতে হবে না। এ দুঃখ ভোগ করতে হবে না। ওকে যে নেবে সে শুধু ভালোবেসেই নেবে। ভালোবাসা ছাড়া সে ওর কাছে আর কিছুই চাইবে না। আহা সে কী সুখ।

'কে সে? বল না অনু?'

শ্রীলেখা আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

অনসূয়া এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'বললাম তো আর একদিন বলব।'

শ্রীলেখা মুখভার করে বলল, 'ও আচ্ছা। না বলতে চাস না বললি। না বললে আমি তো আর জোর করে তোর পেট থেকে কথা বের করে নিতে পারব না।'

'গোপন কথা বুঝি পেটে থাকে?' অনসূয়া একটু হাসল।

কিন্তু শ্রীলেখা হাসল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

বন্ধুর দেখার বস্তুটি কী লক্ষ্য করতে গিয়ে দুটি পামগাছের আড়ালে পুরনো কনভেন্ট স্কুলটা চোখে পড়ল অনসূয়ার, এদিককার জানলাগুলি বন্ধ। বোধ হয় রাস্তার ধার বলেই এই সতর্কতা। কিন্তু বাড়ির জানলা বন্ধ হলেও স্মৃতির দুয়ার এরই মধ্যে খুলে গেছে অনসূয়ার। ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেন—চারটি বছর সে ওই কনভেন্ট স্কুলে কাটিয়ে দিয়ে গেছে। কৈশোরের প্রথম তারুণ্যের পর কত সুখ-দুঃখের আনন্দ-আহ্লাদের স্মৃতি ওই স্কুল-

বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্ব আর ঝগড়া করেছে দিনরাত। তারা আজ কোথায়। সেই সব দিনগুলিই বা কোথায়। কত টিচারের স্নেহ পেয়েছে, বকুনি খেয়েছে। কাউকে ভালোবেসেছে, কাউকে দেখতে পারেনি। তাদের সঙ্গেও অনসূয়ার জীবনের আর কোন যোগ নেই। যোগ নেই তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে রতনদির কথা। আশ্চর্য, তাঁর কথা মাঝে মাঝে কেন এত বেশি করে মনে পড়ে অনসূয়ার? তাঁর স্মৃতি তো সুখের স্মৃতি নয়, শুভ আর সুন্দর জীবনের স্মারক নয়।

'এই শ্রীলেখা, শোন।'

বন্ধুর কাধ ধরে নাড়া দিল অনসূয়া।

শ্রীলেখা মুখ ফিরাল, 'কী বলছিস?'

'ওই কনভেন্ট স্কুলের সাদা বাড়িটা চিনিস? মানে কোন মিস্ট্রেস কি ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ টালাপ হয়েছে? তোরা তো ছ' মাস হলো এ পাড়ায় এসেছিস।'

শ্রীলেখা মুখভার করে বলল 'না ভাই আমার তো স্কুল কলেজের পাট চুকেই গেছে। আমার আর ওসব চেনে কী হবে।'

অনসূয়া একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি? জানিস, ওই কনভেন্টে আমি ছেলেবেলায় অনেকদিন কাটিয়েছি। অনেক বছর।'

শ্রীলেখা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর ছেলেবেলার কথা কে শুনতে চাইছে অনু?'

অনসূয়া বলল, 'আমার ছেলেবেলার জীবন বুঝি আর আমার জীবন নয়? শোন এখানে আমাদের একজন মিস্ট্রেস ছিলেন রতনদি। মিস সরকার। পুরো নাম রত্নমালা সরকার। আমরা যখন তাঁকে দেখি তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। তবু সেই বয়সেও তিনি দেখতে যে কী সুন্দর ছিলেন তোকে কি বলব।'

শ্রীলেখা বাধা দিয়ে বলল 'তোর কিছু বলতে হবে না। চল এবার উঠি। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ওঁর ফিরবার সময় হয়েছে। শাশুড়ী নিশ্চয়ই আমায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। চল বরং বাড়িতে গিয়ে এবার এক কাপ চা খানি। তারপর যদি তোর সময় হয় আর ইচ্ছে থাকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করে যাবি।'

অনসূয়া বলল, 'নিশ্চয়ই আলাপ করব। বিয়ের সময় তো আর সে সুযোগ হয়নি। কিন্তু এখান থেকে তোদের বাড়ি তো মোটে দু মিনিটের পথ। ওই তো দেখা যাচ্ছে। তোর বর এসে নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তোর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকবে। আর যদি বেশি লাজুক হয়,

হাতছানিও দিতে পারে। তখন আমরা একছুটে ওখানে গিয়ে পৌঁছব। ঈস্, কী ছুটোছুটিই না তখন করেছি। জানিস আমি খুব ছুটতে পারতাম। এখনো পারি। রতনদির কাছে কী বকুনিই না খেয়েছি দুষ্টুমি আর দুরন্তপনার জন্যে। রোজ তাঁর ব্ল্যাক বুকে আমার নাম উঠত। শুধু কি আমার? কারো নামই বাদ যেত না। বোর্ডিং হাউসে তখন আমরা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন ছিলাম। ছোট বড় সব মেয়েকেই তিনি কালো দাগে দাগিয়েছেন। অস্থির হোসনে। বোস আর একটু। আর মিনিট পাঁচ-সাত নিশ্চয়ই অরুণবাবু তোর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, দেখতে সুন্দরী হলে কী হবে, রতনদির মন ভালো ছিল না। কী কড়া মেজাজ আর কী নিষ্ঠুর স্বভাবই যে তাঁর ছিল তুই ভাবতেও পারবিনে। আমরা মেয়েরা ছিলাম তাঁর কাছে মশা আর ছারপোকার মত। যদি পারতেন তিনি আমাদের টিপে মারতেন। এমন একজন জাঁদরেল মেয়েমানুষের হাতে বোর্ডিং হাউসের সব রকম কর্তৃত্ব যে কী করে গিয়ে পড়েছিল তা জানিনে। স্কুলে পজিশনের দিক থেকে তিনি হেড মিস্ট্রেস তো দূরের কথা, সেকেণ্ড কি থার্ড টিচারও ছিলেন না। বোর্ডিং হাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদও তাঁকে কেউ দেয়নি। আমার মনে হয়, তিনি নিজেই সব জোর করে দখল করেছিলেন। বয়সে ছিলেন তিনি সবচেয়ে বড়ো। কনভেণ্টে এসেছেনও সবাইর আগে। তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মত জোর কারো ছিল না। সে চেষ্টাও বোধ হয় কেউ করেননি। হেড মিস্ট্রেস মিস পামার ছিলেন শান্তশিষ্ট নির্বিবাদী মানুষ। স্কুলের কাজ আর নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন। লেখার অভ্যাসও তাঁর ছিল। থিয়োলজির ওপর তাঁর অনেক আর্টিকেল শুধু মিশনারি পত্রিকায় নয়, অন্য কাগজেও বেরোত। সেকেণ্ড টিচার রেবাদির ইণ্টারেস্ট ছিল সাহিত্যে। তিনি ইংরেজী নভেল নাটক পড়তে ভালোবাসতেন। থার্ড টিচার সুনন্দাদির ঝোঁক ছিল খেলাধুলো আর গার্ডেনিংএ। তিনি মেয়েদের নিয়ে টেনিস ব্যাডমিণ্টন খেলতেন। আমরাও তাঁকে খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু বলব কি ভাই। আমাদের বুড়ী রতনদির আর কোন কিছুতে ইণ্টারেস্ট ছিল না। না ধর্মে, না সাহিত্যে, না সেলাই বোনায়, না খেলাধুলোয়। কিন্তু মানুষের তো একটা না একটা অকুপেশন চাই। বুড়ীর কাজ ছিল ছোটবড় সব মেয়ের পিছু লাগায়। ওঁর কলীগদেরও তিনি ছেড়ে দিতেন না। তাঁদের পিছনেও তিনি গোয়েন্দাগিরি করতেন। একজনের কথা আর-একজনের কানে লাগাতেন। একজনের অযথা নিন্দা আর-একজনের কাছে করা ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যাস। তিনি হয়তো ভাবতেন এই করে করে তিনি কারো কারো শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা পাবেন। কিন্তু তাই

কি আর পাওয়া যায়? দিদিমণিদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতেন না, শ্রদ্ধা করতেন না, তবে ভয় করতেন। আর সহ্য করে যেতেন। কনভেন্টের অথরিটির সঙ্গে তাঁর কিসের একটু বাধ্যবাধকতা ছিল আমরা কেউ জানিনে। আড়ালে আবডালে দিদিমণিদের মধ্যে কেউ তাঁকে বলতেন শাশুড়ী আবার কেউ বা বলতেন দিদিশাশুড়ী। সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস পেতেন না। যদি তিনি এসব শুনতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর আদরের পুতের বউ আর নাত-বউদের জিভের ডগা আর নাকের ডগা বঁটি দিয়ে কেটে ছেড়ে দিতেন।

একেই তো কনভেন্টের বাঁধাধরা রুটিন লাইফ। তারপর রতনদির এই অত্যাচারে আমরা ত্রাহি ত্রাহি করছিলাম। আমাদের ভোর পাঁচটায় উঠতে হত। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিজেদের জায়গায় বসে প্রেয়ার। তারপর পড়তে বসা। নাওয়ার ঘণ্টা পড়লে নাওয়া, খাওয়ার ঘণ্টায় খেতে যাওয়া। চারটে পর্যন্ত স্কুল। তারপর জলযোগ। তারপর খেলতে যাওয়া। কনভেন্টের উঁচু পাঁচিলঘেরা মাঠ আছে। সেই মাঠে দিদিমণিদের ইচ্ছেমত আমাদের খেলতে হবে। কোন্‌দিন কোন্‌ খেলা হবে তাও শুনেছি আমাদের স্পোর্টসের সুনন্দাদি নয় রতনদিই ওপর থেকে সব ঠিক করে দিতেন। যিনি জীবনে কোনদিন বল ধরেননি, র‍্যাকেট ছুঁয়ে দেখেননি, তবু অন্য রুটিনের মত তাঁর হাতেই ছিল খেলার রুটিনের সুতো। তিনি সুতো নাড়তেন আর আমরা ছোট-বড় পুতুলের দল নাচতাম, ফিরতাম, ঘুরতাম, ছুটতাম। আচ্ছা বল তো শ্রীলেখা, এ ধরনের খেলায় কি আনন্দ পাওয়া যায়? অন্যের ইচ্ছেমত পড়া যায়, কিন্তু খেলাটা যার যার নিজের ইচ্ছেয় হওয়াই তো ভালো। নিজের ইচ্ছেয় না-খেলাটাও খেলা। কিন্তু তা হবার জো ছিল না। একেবারে অসুস্থ হয়ে শুয়ে না পড়লে খেলতে আমাদের যেতেই হত।

সেবার একদিন আমি আর আমার পাশের সীটের বেলা নন্দী যুক্তি করে ঠিক করলাম আমরা খেলতে যাব না। আমরা দুজন তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। বেলা আমার চেয়ে দেখতে ছোটখাটো হলেও বয়সে দু বছরের বড়। মনে মনে তরুণী। আরো দু বছর আগে থেকে সে নভেল পড়ছে আর প্রেমে পড়েছে। তুই শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছিস। সেই প্রমিলরাজ্যে প্রেম আবার কার সঙ্গে। অবাক হবারই কথা। ছুটিছাটায় যখন কনভেণ্ট থেকে বাড়িতে যেতাম সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা পুরুষের—তা সে বালকই হোক, যুবকই হোক, বৃদ্ধই হোক কারোরই নাম শুনতাম না, গন্ধ পেতাম না, দাড়ি-গোঁফ দেখতাম না। অবশ্য দিদিমণিদের কারো কারো ঠোঁটে গোঁফের আভাস ছিল—সেই মেয়েলি গোঁফ বাদে। এই অবস্থায় কি করে প্রেম সম্ভব। কিন্তু বেলা ছিল অসাধারণ মেয়ে। ও ছুটিতে যখন বাড়ি যেত পাড়ার

ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আসত। কেউ বা দাদার বন্ধু, কেউ বা বোনের প্রাইভেট টিউটর, কেউ বা জামাইবাবুর ভাই। যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব জমত তার সঙ্গে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করত। ডাকে না। ডাকের সব চিঠি রতনদি সেনসর করে দিতেন। চিঠি আনাগোনার অন্য একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। যে সব মেয়ে বাইরে থেকে স্কুলে পড়তে আসত তাদের কেউ কেউ ছিল বেলার কূটনৈতিক দূতী। তারা বই খাতার মধ্যে লুকিয়ে এসব চিঠি নিয়ে আসত নিয়ে যেত। এই দুঃসাহসিক কাজের বদলে তারা বেলার কাছ থেকে লজেন্স বিস্কিট কি নগদ পয়সা টয়সা পেত।

আমি বেলাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি, 'বেলা অত ঝুঁকি নিতে যাসনে। কবে ধরা পড়বি আর রতনদি তোকে ফাঁসিতে লটকে ছাড়বে।'

বেলা বলেছে, 'দূর, বুড়ী আমার সঙ্গে চালাকিতে পারবে নাকি? রতনদি হাঁটে ডালে ডালে আমি হাঁটি পাতায় পাতায়।'

এই সাহস কেবল বেলার একারই ছিল না। ওর দলে আমাদের ডরমিটারির অন্তত আরো দু-তিনজন মেয়ে ছিল। তবে তাদের সঙ্গে আমার তেমন ভাব ছিল না।

আমি আর বেলা যে সেদিন খেলতে গেলাম না তার কারণ দুখানি চোরাই নভেল আমাদের হাতে এসে পেঁাছেছে। নির্জন ঘরে বসে আমরা তা পড়ব। আর বেলার বন্ধু সমীর দাস যে চিঠি পাঠিয়েছে আমরা দুজনে মিলে তার জবাব দেব। আমাকে না হলে বেলার চিঠি লেখা হত না। নিজের হাতের লেখার জন্যেও ওর ভারি লজ্জা ছিল। তাই আমাকেই সব করে দিতে হত। কে নাকি বলেছিল আমার হাতে অমুকে এসে তামাক খেয়ে গেছে, বেলাও তেমনি আমার হাতে প্রেম করত। পরে বুঝেছিলাম, ভিতরে ওর আরো একটু মতলব ছিল। যদি ধরা পড়ে আমাকেও জড়িয়ে নিতে পারবে।

সেদিন আমরা খেলতে নামলাম না। জ্বরের ভান করে সেই বোশেখ মাসের গরমেও মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম।

ডরমিটারি একেবারে খালি। একটি মেয়ে তো ভাল, একটি মাছিও কোথাও নেই। স্কুলের ছুটির পর দিদিমণিরা যে যাঁর বেড়াচ্ছেন বুনছেন, বই পড়ছেন, চিঠি লিখছেন। বেলা আর আমি স্প্রীংয়ের খাটে উঠে বসে গল্প করতে লাগলাম। বেলা প্রাণ ভরে তার ভালবাসার গল্প বলে গেল। ওর মন আজ বড় উদার। বেলা বলল, 'হাঁ করে তুই কেবল আমার কথাই শুনছিস। তুই নিজেও লভে পড়-না অনু! আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

আমি হেসে বললাম, 'না ভাই, তার আর দরকার নেই। একা তোর প্রেমের জ্বালাতেই আমি অস্থির। এর পর যদি নিজেও পড়ি আর উপায় থাকবে না।'

তুই তো জানিস লেখা, স্কুলে কেন কলেজ লাইফেও মকরকেতন আমার কাছে শুধু কৌতুকের কেতনই ছিলেন। যারা প্রেমে পড়ত আর ছটফট করত তাদের দেখে আমার হাসি পেত।

সমীরের চিঠিটার কী জবাব দেওয়া যায় তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ দেখি চোখ দুটি কপালে তুলে বেলা একেবারে চুপ করে গেছে।

আর কেউ নয়, ছায়ামূর্তির মত রতনদি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর পায়ে সাদা রবারের জুতো, তা পরে কনভেন্টের ঘরে, বারান্দায়, করিডোরে নিঃশব্দে তিনি ঘুরে বেড়ান। তাঁর গায়ে ওই গরমের মধ্যেও ফুলহাতা জামা, পরনে কালোপেড়ে মিহি শাড়ি, ঘন রুপালী চুলের রাশ কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। এই বয়সেও তাঁর গায়ের সে কী রং, টিকোল নাক, পাতলা ঠোঁট, টানা টানা ভুরু। আজ এতকাল বাদে তোর কাছে তাঁর রূপের বর্ণনা দিতে পারছি, কিন্তু সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর রূপ দেখিনি। সেদিন এক ডাইনী বুড়ীকে হঠাৎ সামনে দেখে আমরা আঁতকে উঠেছিলাম। তাঁর কোটরে বসা চোখ দুটি জ্বলছিল।

'কী করছ তোমরা?'

বেলা অস্ফুট গলায় বলল, 'আমাদের জ্বর হয়েছে।'

'এই বুঝি জ্বরের নমুনা?'

'আজ্ঞে, নার্সকে জিজ্ঞেস করুন।'

ডাক্তার দূরে থাকতেন। কিন্তু নার্স আমাদের কনভেন্টের মধ্যেই ছিল। আমাদের অসুখ বিসুখ হলে দেখবে, সেবাশুশ্রূষা করবে এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু মুখ-খিঁচুনির ভয়ে তার হাতের সেবা আমরা কেউ চাইতাম না। তবু বেলা নার্সকে মাঝে মাঝে দু-এক টাকা দিয়ে বশ করেছিল। কিন্তু রতনদি যে তার কথা বিশ্বাস না করে নিজেই আমাদের জ্বর যাচাই করতে আসবেন তা কে জানত?

রতনদি এসে আমার কপালে হাত রাখলেন। সাদা, লম্বা লম্বা রোগাটে আঙুল। ডাইনীর আঙুলের ছোঁয়ায় আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল।

রতনদি বললেন, 'হুঁ।'

তারপর বেলার কপালে ফের সেই হাতখানা রাখলেন। কিন্তু তার আগেই জ্বরের জ্বালা আর প্রেমের জ্বালা সব জুড়িয়ে ফেলে বেলা একেবারে বরফ হয়ে রয়েছে। রতনদি তাপ পাবেন কোথায়? তবু তিনি নার্সকে হুকুম দিলেন 'থার্মোমিটারটা দাও তো।'

নার্স ভয়ে ভয়ে থার্মোমিটারটা তাঁর হাতে এগিয়ে দিল।

রতনদি চাদরটা উলটে ফেলতেই সমীরের দেওয়া নভেলখানা বেরিয়ে পড়ল।

রতনদি বললেন, 'হুঁ। এই জ্বর তোমাদের!'

তা সত্ত্বেও থার্মোমিটার বগলে লাগিয়ে আমাদের দুজনেরই টেম্পারেচার নিলেন। আমি লর্ড ক্রাইষ্টকে মনে মনে ডাকতে লাগলাম। বেলা হিন্দুর মেয়ে। তেত্রিশ কোটির মধ্যে ও অন্তত তেত্রিশ জনের নাম জপ করল। কিন্তু কিছুতেই আমাদের টেম্পারেচার সাড়ে সাতানব্বইয়ের ওপরে উঠল না।

রতনদি নার্সকে বললেন, 'ওদের দুজনকে 'সিক রুম'-এ নিয়ে যাও।'

নার্স বলল, 'আজ্ঞে ওরা তো --'

রতনদি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি তাই করো। ওরা যখন অসুস্থ, ওদের 'সিক রুম'-এ নিয়ে রাখাই ভাল।'

আমরা বললাম, 'রতনদি, এবারকার মত আমাদের মাফ করুন।'

তিনি বললেন, 'মাফের কোন কথাই ওঠে না। You are diseased, you require proper treatment.'

'সিক রুম' ছিল আমাদের কাছে বিভীষিকা। সত্যি সত্যি অসুস্থ হলেও আমরা কেউ সেখানে যেতে চাইতাম না। আমাদের নার্স ঠিক ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ছিল না। তার রণচণ্ডীর মূর্তিই সেখানে আমরা দেখেছি। যেমন তার কড়া ওষুধ, তেমনি কড়া মেজাজ আর তেমনি বিশ্রী পথ্য।

তবু সেই 'হেল'-এ রতনদি আমাদের ঠেলে পাঠালেন। মিথ্যে বলবার শাস্তি আমরা সেখানে দেড় দিন থেকে ভোগ করলাম।

রেবাদি, সুনন্দাদিরা শুনেছি আমাদের পক্ষ নিয়ে একটু বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রতনদি তাঁদের কাউকে আমল দেননি। ধমক দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই ওরা এমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

তারপর থেকে আমাকে আর বেলাকে রতনদি খুব চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। অন্য ঘরে বেলার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভয়ে ওর সঙ্গে কথাই বলিনে। তবু রতনদি আমার দিকে কী রকম চোখ করে তাকান। দেখতে ভয় লাগে। তিনি যেন আমার অসৎ বুদ্ধির তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চান।

বেলার কিন্তু এততেও শিক্ষা হল না। সে তেমনি চিঠি চালাচালি করতে লাগল। তার পর একদিন আয়ার হাতে ধরা পড়ে গেল। রতনদি গোপনে গোপনে আয়াকে গোয়েন্দা হিসেবে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একখানা চিঠির সূত্র ধরে বেলার সব চিঠি তার বাক্সের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি ওকে চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলাম। বেলা জবাব দিয়েছিল 'ও কথা বলিসনে ভাই। ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে পুড়ে যায়।'

কিন্তু চিঠিগুলি আবিষ্কার করে রতনদি নিজেই পুড়িয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে বেলার বাবা এসে তাকে নিয়ে গেলেন। আমরা বললাম, ও বেঁচে গেল।

অবাধ্যতার জন্যে ছোটখাট চুরি কি দুষ্টুমির জন্যে রতনদি এমন আরো দু-তিনটি মেয়েকে কনভেণ্ট-ছাড়া করেছিলেন।

এরপর থেকে কনভেণ্টে কড়াকড়ি আরো বেড়েই গেল। মেয়েতে মেয়েতে যে বন্ধুত্ব তাও রতনদি পছন্দ করতেন না। আমার মনে হয়, যে কোন দুজনের মধ্যে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা দেখলেই তাঁর এক ধরনের হিংসে হত। তিনি টিচার আর ছাত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে পারতেন না। ওপরের ক্লাসের কোন মেয়ের সঙ্গে নীচের ক্লাসের কোন মেয়ের মেলামেশা দেখলে আপত্তি করতেন। তাতেও নাকি খারাপ হবার ভয় আছে।

রতনদি ফুল ভালবাসতেন না, কবিতা ভালবাসতেন না, চাঁদের আলো থেকে মুখ লুকিয়ে থাকতেন। পৃথিবীর যা কিছু কোমলতা কমনীয়তা তার ওপর তিনি যেন খড়্গহস্ত ছিলেন।

আমাদের কনভেণ্টের লনে কতরকমের ফুল ফুটত। বড় বড় ডালিয়া, ক্যানা, নানা জাতের নানা রঙের লিলি। দেশী ফুলের মধ্যে জুঁই, বেলি, চামেলি। সুনন্দাদি নানা জাতের গোলাপও এনেছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ সেসব ফুল তুলতে পারতাম না। রতনদির ধারণা ছিল, ফুল মেয়েদের মনের নরম মাটিকে আরো বেশি নরম করে দেবে। আর সেই মাটিতে যত সব অবাঞ্ছিত আগাছা জন্মাবে। একটি মেয়ে খোঁপায় ফুল পরেছিল বলে তার ফাইন হয়ে গেল। তারপর থেকে খোঁপা বাঁধা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমরা চুল শুধু বিনুনি করে রাখতাম। কখনো দুটি, কখনো একটি।

একবার আমাদের হেড-মিস্ট্রেস মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, 'তোমরা এই বাগানের ফুলের মত সুন্দর হও, পবিত্র হও।'

তা শুনে রতনদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'হেড-মিস্ট্রেস জানেন না, ফুলের কীটগুলি তাঁর ডরমিটারিতে গিজ গিজ করছে।'

যত দিন যেতে লাগল রতনদির মেজাজ তত খিটখিটে হয়ে উঠল। রাগ বাড়ল, বকুনির মাত্রা বাড়ল। রেবাদি আর-এক স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। সুনন্দাদি বিয়ে করে কনভেণ্ট ছেড়ে দিলেন। তাই নিয়ে বুড়ীর কি গজগজানি। সুনন্দাদি নাকি আগে থেকেই খারাপ ছিল।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। রতনদির দুটি বড় পুতুল ছিল, কে যেন তা চুরি করে নিয়ে গেল। আমরা সন্দেহ করলাম, নতুন আয়াটারই এই কীর্তি; সে সোনার লোভে দুটো পুতুলকে সরিয়েছে। পুতুল দুটিকে রতনদি সোনা দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। কখনো শাড়ি পরাতেন, কখনো ধুতি পরাতেন।

আদর করে ডাকতেন, 'আমার নূপুর ঝুমুর।' আয়া কিন্তু কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। রতনদি তাকে অনেক বকলেন, ভয় দেখালেন, লোভ দেখালেন, কিন্তু নূপুর ঝুমুরকে পাওয়া গেল না।

রতনদি দোতলায় পূর্বদিকের সবচেয়ে নির্জন আর ছোট ঘরটিতে থাকতেন। জিনিসপত্রে বোঝাই বড় একটা ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস তালাবন্ধ করে তিনি খাটের তলায় রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুতুল দুটি যে কাঁচের আলমারিটায় থাকত, তাতে তিনি চাবি দিতেন না। মেয়েদের খবরদারি আর শাসন-শাস্তির ফাঁকে তিনি যখনই ঘরে আসতেন সঙ্গে সঙ্গে আলমারি খুলে পুতুল দুটিকে আদর করতেন। তাদের গয়না বদলাতেন, বেশ পালটে দিতেন। তিনি তাঁর শাসন আর স্নেহকে একেবারে আলাদা দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন! শাসনের ভাগ পড়েছিল আমাদের ভাগ্যে আর নিষ্প্রাণ পুতুল দুটির ভাগে ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ। কিন্তু সব তাঁর গোপন ছিল। এই নিয়ে কেউ কোন ঠাট্টা-তামাশা করলে তিনি চটে উঠতেন। তবু ব্যাপারটা সবাই জানত। দিদিমণিরা বলতেন, 'রতনদির হৃদয়ের সমস্ত মধু ওই পুতুল দুটি চুরি করে নিয়েছে। আমাদের জন্যে হুল ছাড়া আর কিছুই নেই।'

এই পুতুল দুটির বয়স যে কত ছিল তা কেউ ঠিক করে বলতে পারত না। কেউ বলত বিশ বছর, কেউ বলত তিরিশ বছর, কেউ বলত আরো বেশি।

পুতুল দুটি চুরি যাওয়ায় রতনদি একেবারে ক্ষেপে গেলেন। মারমূর্তি হয়ে হেড-মিস্ট্রেসের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন বললেন 'পুলিসে খবর দাও।'

হেড-মিস্ট্রেস শান্তভাবে বললেন, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে পুলিস টুলিস ডাকলে কনভেন্টের সুনাম নষ্ট হবে। আমরা টাকা দিচ্ছি, আপনি বরং আর দুটি পুতুল কিনে নিন।'

এতে রতনদি আরো ক্ষেপে গেলেন, 'কী, তোমাদের এত টাকার জোর হয়েছে আমাকে টাকার লোভ দেখাও। আমি তোমাদের প্রত্যেকের বাক্স প্যাটরা তল্লাসী করব। ছাত্রীই হোক আর টিচারই হোক, কাউকে বাদ দেব না। আয়া, নার্স, মেট্রন সব আমার সঙ্গে এসো। আমি সব সার্চ করব।'

কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। সবাই হেড-মিস্ট্রেসের ইঙ্গিতে দূরে সরে রইল। কোন ছাত্রী কি কোন টিচার তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না।

রতনদি চেঁচিয়ে কেঁদেকেটে সারা কনভেণ্টকে অস্থির করে তুললেন, 'তোরা সবাই আমার শত্রু। আমি এতদিন শত্রুপুরীতে বাস করে এসেছি। আজ বুঝতে পারলাম।'

রাগ করে রতনদি নিজেই পুলিস ডাকতে যাচ্ছিলেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে

অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁকে তুলে এনে তাঁর নিজের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। জ্ঞান অবশ্য তাঁর খানিক বাদেই ফিরে এল। কিন্তু শোকে দুঃখে তিনি সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠতে পারলেন না।

তাঁর ঘর থেকে আমাদের ডরমিটারি বেশ দূরে। তবু অনেক রাত্রে আমরা তাঁর কান্না শুনতে পেতাম, 'আমার নূপুর ঝুমুর রে, আমার নূপুর ঝুমুর রে।'

সেই কান্না শুনে আমাদের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যেত। এতদিন তাঁর শাসনকে ভয় করেছি। আজ তাঁর কান্নাকে তার চেয়েও বেশি ভয়। অতগুলি মেয়ে থাকতাম আমাদের ডরমিটারিতে। কিন্তু অনেক রাত্রে আলাদা আলাদা মশারির তলায় শুয়ে আমাদের মনে হত আমরা প্রত্যেকে একা। আমাদের যেন কেউ নেই! বাপ মা বাড়িঘর ছেড়ে যেন কতদূরে আমরা এসে পড়েছি। ছোট ছোট সাদা মশারিতে ভরা বিরাট সে ঘরটা এক সাগরের মত। সেই সাগরে আমরা আলাদা আলাদা এককেটা দ্বীপ। আমাদের চারদিকে অবুঝ অফুরন্ত কান্নার ঢেউ 'আমার নূপুর ঝুমুর রে, আমার নূপুর ঝুমুর রে।'

রতনদির হার্ট-ডিজিজ বাড়ল, রক্ত আমাশয় বাড়ল। তারপর তাঁকে কলকাতার বড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কিছুদিন বাদে আমাদের স্কুল গরমের জন্যে ছুটি হয়ে গেল। স্কুল খোলার সাত দিন আগে রতনদি মারা গেলেন।

আমরা ভেবেছিলাম আমাদের চার্চের লাগা গ্রেভইয়ার্ডে খুব জাঁকজমক করে আমরা তাঁর সমাধি দেব। তাঁর জন্যে এপিটাফ লেখা হয়েছিল, মার্বেলের স্লাব কেনা হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর ডেড-বডিই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কনভেন্টের ছুটির মধ্যে তিনি মারা গেছেন। টিচাররা কেউ কাছাকাছি ছিলেন না। রতনদির আত্মীয়-স্বজনের কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আনক্লেমড্ বডি বলে হাসপাতালের অথরিটি কোথায় তাঁর শব সরিয়ে দিয়েছেন কে জানে।

আমাদের হেড-মিস্ট্রেস দেশ থেকে ফিরে এসে খুব রাগ করে হাসপাতালকে কড়া চিঠি দিলেন। কেস করবেন বলে ভয় দেখালেন। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।

রতনদি যে মারা গেলেন তার চেয়েও তাঁর দেহটা যে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল সেই দুঃখটাই আমাদের মনে বেশি করে বাজল। তিনি আমাদের হাতের মাটি নিলেন না যেন পরম অভিমানে তাঁর দেহসুদ্ধ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

তবু আমরা তাঁর জন্যে প্রেয়ার করলাম, তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা

করলাম। মিটিং-হলে টিচাররা কনভেণ্টের জন্যে তাঁর ত্যাগ সেবা আরো নানারকম গুণের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দিলেন। আর আমরা মেয়েরা ওকে লুকিয়ে কেন জানিনে, চোখের জল ফেললাম।

রতনদি মারা যাওয়ার পরে পুরনো টিচারদের মুখে, বুড়ো মালীর মুখে তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলাম। প্রথম যৌবনে রতনদি নাকি কাকে ভালো-বেসেছিলেন কিন্তু সে ভালোবাসা ফিরে পাননি। অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। সবই কিংবদন্তী।

কিন্তু আমার মনে হয় অন্যরকমও হতে পারে শ্রীলেখা। এমন ভালোবাসাও জীবনে আসে হয়তো তা ভালোবাসা নয় শুধু প্যাশন—যা সহ্য করা যায় না। আবার সহ্য না করলে আর একটা দিকে হয়তো একটা পুরো সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। অতৃপ্ত তৃষ্ণা যেমন হৃদয়কে শুকিয়ে দেয়, বিতৃষ্ণাও তেমনি। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় শ্রীলেখা একটা মাস্টারি-টাস্টারি নিয়ে ফের এই কনভেণ্টে এসে লুকোই। কিন্তু ভয় হয় যদি "আমি আর একটি রতনদি হয়ে উঠি!"

অনসূয়া থামল।

পার্কে এখন আর কেউ নেই। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। অন্ধকার এবার ঘন হয়ে উঠল। চারদিকের গাছপালাগুলির উপর কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। কানের কাছে মশার গুনগুনানির আর বিরাম নেই। কিন্তু শ্রীলেখার কিছুই যেন খেয়াল ছিল না। যার জন্যে এত কৌতূহল অনসূয়ার সেই শেষ আত্মোদ্ঘাটনও তার কানে যায়নি। অবাক হয়ে শ্রীলেখা শুধু রতনদির কথাই ভাবছিল। পৃথিবীতে এত সুখ, এত শান্তি, তবু একেকটি জীবন কেন এমন মরুভূমি হয়ে যায় পাগলের প্রলাপের মত কেন একেবারেই তার কোন অর্থ থাকে না!

॥ মালা ॥

ট্রেণ ছোট একটি ষ্টেশনে এসে থামল। যে কামরায় বেশি ভিড় তাতেই যেন লোক বেশি উঠতে চায়। থার্ডক্লাসের এ কামরাটি যাত্রীতে আগেই একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে। বাংলার চেয়ে বিহার উড়িষ্যার মজুর শ্রেণীর লোকই এখানে বেশি। শ্যামলেন্দু একটি বেঞ্চের এক প্রান্তে প্রাপ্যের চেয়েও কম একটু জায়গা দখল করে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল। শ্যামলের বয়স বাইশ তেইশের বেশি হবে না। কিন্তু ওর গালে হাত দিয়ে ভাববার ভঙ্গি দেখে যে কেউ মনে করতে পারত ছেলেটি যেন ষাট বছরের বুড়ো, যেন একটি পুরো সংসারের অর্থচিন্তা, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীর দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়েছে, কি এক বিপুল সম্পত্তি নীলাম হয়ে যাচ্ছে, না হয় লাখ টাকার ব্যবসা ভরাডুবি হচ্ছে।

একটু বাদে উদ্বিগ্ন যুবকটি হঠাৎ তার ভাবনার সমুদ্র থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। হোল্ড-অলটা সে এখনো খোলেনি। বিছিয়ে বসবার জায়গা ছিল না। ষ্টিলের কালো ভারি সুটকেসটার সঙ্গে সেই গুটানো হোল্ড-অলটা সে বাঙ্কের উপর তুলে রেখেছিল। এবার সে দ্রুত হাতে সেগুলি নামিয়ে নিল। সুটকেসটা হাতে আর হোল্ড-অল্টা বগলে নিয়ে শ্যামল তাড়াতাড়ি দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পাশের বেঞ্চ থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন মশাই? গাড়ি যে ছেড়ে দিয়েছে। আপনি কি পাগল না কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন?'

শ্যামল অস্ফুট গলায় বলল, 'গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে?' যেন এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেড়ে দেবে না? এ তো আর জংশন ষ্টেশন নয়, এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? আপনি কোথায় নামতে চান বলুন তো? এর আগের ষ্টেশনেও আপনি এরকম করেছিলেন। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর নামতে যাচ্ছিলেন। কী হয়েছে আপনার?'

শ্যামল বলল, 'কিছু হয়নি, Please leave me alone.'

ওরে বাবা, এ যে আবার ইংরেজী ফুটোচ্ছে।

'বাংলায় বলুন মশাই, বাংলায় বলুন। ইংরেজী বুঝিনে।'

তাঁর সহযাত্রী আর এক ভদ্রলোক বললেন, 'আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবার জো নেই, এরা না জানে ভদ্রতা, না জানে আদব-কায়দা। কক্ষণো

ওদের ভালো করতে যাবেন না মশাই। সদুপদেশ সুপরামর্শ দিতে যাবেন না। দিতে গেলে ঠকবেন।'

'কী উদ্দেশ্যে নামতে যাচ্ছিল তাই বা কে জানে। দেখুন না ওর বাক্স-পেঁটরা খুঁজে। কার কী সরাচ্ছে।' তৃতীয় ভদ্রলোক একটু বক্র মন্তব্য করলেন।

প্রথম ভদ্রলোক বললেন 'না না ওসব কিছু নয়। ছেলে ভদ্রলোকেরই। হাওড়া ষ্টেশনের টিকিট কেটেছে। আমরা একই ষ্টেশন থেকে উঠেছি। কিন্তু সেই প্রথম থেকেই যেন নামবার জন্যে অস্থির। একেকটা ষ্টেশন আসছে আর ছেলেটি চঞ্চল হয়ে উঠছে। অথচ ঠিক নামছেও না।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি যখন সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন, লক্ষ্য রাখবেন মশাই। কাঁচা বয়স কখন কী মতিগতি হয় বলা তো যায় না। এই ট্রেণেই গতবার একটি ছেলে গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার ফলে ট্রেণটা একঘণ্টা লেট হয়ে গেল। হাঙ্গামা হৈচৈ। সে কি সহজ ব্যাপার। ট্রেণটা ভালো নয় মশাই। বড় অপয়া।'

শ্যামল কোন মন্তব্য করলো না, কোন বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে গেল না। বাইরের অন্ধকারের দিকে মুখ করে বসে রইল। তাকে বাদ দিয়ে সহযাত্রীদের আলোচনাটা গত বছরের সেই হতভাগ্য ছেলেটিকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। শ্যামলের পূর্বগামী সেই ছেলেটি নাকি চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। সে নিশ্চয়ই বাঁচেনি। শ্যামল কিন্তু আত্মহত্যা করতে করতে বেঁচে গেছে।

দ্রুতবেগে একস্‌প্রেস ট্রেণটি ছুটে চলেছে। অন্ধকার আর গাছপালার আড়ালে ঢাকা অখ্যাত অপরিচিত সব গ্রাম নিমেষের মধ্যে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু জানলার ফ্রেমে আঁটা ছোট আকাশটুকুতে কয়েকটি তারা কে যেন ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। কোত্থেকে মুহূর্তের জন্যে বাতাবি ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল। কিন্তু সেই চলন্ত ট্রেণটা সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে এসেছে।

আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছিল শ্যামল। না, ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে নয়, বিষ খেয়ে নয়, বর্ষার খরস্রোতা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েও নয়। তবু যা করতে যাচ্ছিল তা আত্মহত্যাই। শ্যামল অনেক কষ্টে রক্ষা পেয়েছে। আকস্মিকভাবে নিতান্তই একজন হিতৈষীর সাহায্যে বিপদের হাত এড়াতে পেরেছে শ্যামল।

জীবনে আকস্মিকতার স্থান কে বলে যে নেই? খুব আছে, খুব আছে। বি. এ. ফেল করাটাও তার আকস্মিকতা। সে কি ভাবতে পেরেছিল

ইকনমিকসে একেবারে ফেল করে বসবে? আর বড়দা ছোড়দা থেকে শুরু করে সবগুলি ছোট ভাইবোনের অনুকম্পার পাত্র হয়ে পড়বে? আপন ভাইবোন নয়, সব জেঠতুতো খুড়তুতো। বাপ মা নেই, জেঠীমা কাকীমা নেই, অন্দরে বউদিরাই সর্বেসর্বা। তাঁরা পর্যন্ত বলতে লাগলেন, 'পরীক্ষার আগে শ্যামল কি আর বই নিয়ে বসেছে যে পাশ করবে? কেবল আড্ডা আর আড্ডা।'

বড়দা বললেন, 'শ্যামল যদি বই নিয়ে বসবে, পাড়ার ক্লাবের মোড়লী করবে কে?'

ছোড়দা বললেন, 'আই এ-তে একবছর গিয়েছিল, বি. এ-তে আর এক বছর গেল। এসব ছেলের পড়ে কী আর হবে। তাছাড়া পাশকোর্সে পাশ করাও যা না করাও তা। আর সরস্বতীর পা ধরে সাধাসাধি না করে একেবারে লক্ষ্মীর দোরে গিয়ে ধর্ণা দিক। এই বাজারে যে যেভাবে পারছে করে খাচ্ছে। কোন কিছুতে নিন্দা নেই। টাকা আনতে পারলেই হল।'

মেজদি বলল, 'পড়া ছাড়তেই হবে এমন কি কথা আছে? প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেট হিসেবেও পরীক্ষা দিতে পারে।' মেজদির ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত বিদ্যা। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে সবজান্তা হয়ে গেছে। পৃথিবীর যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বেশ কনফিডেন্সের সঙ্গে কথা বলে।

শ্যামল ঠিক করে ফেলেছিল, আর একবার যদি পরীক্ষা দেয়, প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেট হয়েই দেবে। দাদাদের খরচে আর পড়বে না।

কলকাতায় কি আশে-পাশে কোথাও একটা মাষ্টারি-টাষ্টারি জোটে কি না চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিল শ্যামল। ক্লাবের সীতু দত্তের বাবা সুশীল দত্ত বললেন, 'তুমি যদি বাইরে যাও আমি তোমাকে কাজ জুটিয়ে দিতে পারি।'

শ্যামল বলল, 'বেশ, যাব। কাজ পেলে যে-কোন জায়গায় যেতে রাজী আছি।'

সুশীলবাবু বললেন, 'তাহলে চলে যাও আমাদের নন্দীপুর এম-ই স্কুলে। সেখানকার হেডমাষ্টার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। একজন হেডমাষ্টার আমাদের চাই। আমি স্কুল-কমিটির মেম্বার। এক সময় সেক্রেটারীও ছিলাম। আমি চিঠি লিখে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার চাকরী হয়ে যাবে।'

শ্যামল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নন্দীপুর কোথায়?'

সুশীলবাবু হেসে বলেছিলেন, 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন? জায়গাটা পৃথিবীর মধ্যেই—ওয়েষ্ট-দিনাজপুরে। ঘুরে এসো না। গ্রাম সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতাও হবে। তাছাড়া ভালো না লাগলে একমাস আগে নোটিশ দিয়ে চলে আসবার পথ তো তোমার খোলাই আছে।'

হাতিবাগানে সুশীলবাবুদের কাপড়ের দোকান আছে। বেশ ধনী অবস্থাপন্ন মানুষ, দেখলেই তা বোঝা যায়। তিনি সুপারিশ করলে চাকরি হয়ে যেতে পারে ঠিকই। কিন্তু শ্যামল কি যেতে পারবে? শেষ পর্যন্ত এম-ই স্কুলের হেডমাষ্টারী! তাও পাণ্ডববর্জিত এক গ্রামে। যাওয়া কি উচিত হবে তার? সেখানে গেলে পড়াশুনো কি আর হবে শ্যামলের? দুদিন ভাববার জন্য সময় নিয়েছিল শ্যামল।

নিজের মনের মধ্যে দুই ডিবেটরকে খাড়া করে যাওয়ার অনুকূলে আর প্রতিকূলে তাদের মুখে জোরালো জোরালো যুক্তি বসিয়ে দিল শ্যামল। শেষ পর্যন্ত হাওয়াটা যাওয়ার দিকেই বইল। বাড়ির লোকজন, পাড়ার বন্ধু-বান্ধব, সবাই চার দিকে যে ভাবে তাকাচ্ছে, কমবয়সীরাও যে ভাবে স্নেহ আর সহানুভূতির সুরে কথা বলছে তাতে, কিছুদিন ওদের চোখের আড়ালে গিয়ে বাস করা মন্দ নয়। যৌথ সংসারের দারিদ্র্য, মনোমালিন্য আর নিত্যকার ঝগড়া-ঝাঁটির হাত থেকেও তো কিছুদিনের মত সে রেহাই পাবে। গ্রামের স্নিগ্ধ আর নির্জন পরিবেশে বসে পড়াশুনো করবে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ স্থির করবে। আর যদি সেখানে ওর মন না টেঁকে, যে দিকে চোখ যায় চলে যাবে শ্যামল। এই বিরাট পৃথিবী তার জন্যে খোলা পড়ে আছে।

যাবার দিনে শ্যামল অবশ্য বাড়ির কাউকে জানিয়ে গেল না। মাষ্টারি নিয়ে সে অজানা অচেনা এক গ্রামে চলে যাচ্ছে শুনলে দাদারা নিশ্চয়ই যেতে দেবেন না। তাই আসানসোলে এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে বলে শ্যামল দাদা, বউদি, দিদি আর ছোট ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কিন্তু দুবার গাড়ি বদল করে ফেরি ষ্টীমারে নদী পার হয়ে নেমে পড়ল বিহার সীমান্তের একটি ছোট ষ্টেশনে।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছোট ছোট তিন চারটি ছেলেকে নিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। শ্যামল গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতেই তিনি তার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আপনিই কি শ্যামলেন্দু সরকার? কলকাতা থেকে আসছেন?'

শ্যামল বলল, 'আজ্ঞে হ্যা।'

'সুশীল আমাকে টেলিগ্রাম করে সব জানিয়েছে। আমি ওই স্কুলের সেক্রেটারী। আমার নাম জীবনবিলাস চৌধুরী।'

শ্যামল বলল 'ও হ্যাঁ, সুশীলবাবু আপনার নামেই একখানা চিঠি দিয়েছেন।'

সুটকেসটা নামিয়ে রেখে শ্যামল বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করতে চেষ্টা করল।

জীবনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক থাক আর চিঠিতে কী হবে। আমি আপনাকে দেখেই সব বুঝতে পেরেছি। ভগবানের দেওয়া সার্টিফিকেট আপনার চোখেমুখে ছড়িয়ে আছে। আপনার অন্য সার্টিফিকেটের তো আর দরকার নেই।'

একথায় শ্যামল একটু লজ্জিত হল। সে যে দেখতে সুন্দর সেকথা সে নানাভাবে নানাজনের মুখেই শুনেছে। দিদিরা বউদিরা সস্নেহ কৌতুকে বলেছেন যাত্রাদলের ছেলে। মাকাল ফল। ফুলের মধ্যে পলাশ শিমুল। উপযুক্ত গুণের সমর্থন না পাওয়ায় রূপটা তার কাছে লজ্জার বস্তু হয়েই ছিল। সেই রূপের এমন নতুন অভিনন্দন শ্যামল এই প্রথম শুনল। ভগবান সে নিজে মানে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু শিশু কি বৃদ্ধের মুখে ভগবানের নাম তার কানে যে শ্রুতিকটু লাগে, তা নয়।

ভদ্রলোক আরও লজ্জা দিলেন শ্যামলেন্দুকে। তিনি ছেলেদের ইঙ্গিত করতেই তাদের মধ্যে সব চেয়ে যে লম্বা, সে এগিয়ে এসে দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে শ্যামলের গলায় টুপ করে একটা মালা পরিয়ে দিল। শ্যামল বিব্রত হয়ে বলল, 'এ কী, এ আবার কী!'

যেন একটি স্নিগ্ধ মৃদুগন্ধী টগর ফুলের মালা নয়, এক সুতোনালী সাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তেমনি ভাবে চমকে উঠল শ্যামল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে মালাটা খুলে নিল।

জীবনবাবু হেসে বললেন, 'এরাই তো আপনার ছাত্র। গুরুবরণ করতে এসেছে।'

শ্যামল ভাবল গুরুবরণ আবার কী। এ আবার কী ধরনের ভাষা। এ কোন্ পৌত্তলিকের দেশে এসে পড়ল শ্যামল।

কুলিটুলি যে নেই তা নয়। কিন্তু কুলি কেউ ডাকল না। যে তিনটি ছাত্র এসেছিল তারাই কাড়াকাড়ি করে শ্যামলের হোল্ডঅল আর সুটকেসটা টেনে নিয়ে গেল। সবচেয়ে যে ছোট আর রোগা, তারই জেদ বেশি। সে শ্যামলের ভারি সুটকেসটা জোর করেই মাথায় তুলে নিল। তার ঘাড় ভাঙবে না শ্যামলের সুটকেস ভাঙবে তা বলা কঠিন।

স্টেশন থেকে পাঁচ সাত মিনিট পথ হেঁটে যাওয়ার পর একটি নদীর দেখা মিলল। বর্ষার ভরা নদী। ঘোলাটে জল। খরস্রোতা। শ্যামল নাম জিজ্ঞাসা করে জানল—কাঞ্চনা। এপার-ওপার রেলওয়ে ব্রীজে যুক্ত।

জীবনবাবু বললেন, 'আপনার পক্ষে ব্রীজ পার হওয়া কষ্টকর হবে। তার চেয়ে চলুন খেয়ানৌকায় পার হয়ে যাই।'

কিন্তু নৌকায় উঠতেই শ্যামলের ভয়। ডুবে-টুবে যাবে না তো। যা

স্রোত নদীতে। সাঁতার অবশ্য সে একটু আধটু জানে। কিন্তু তার পরীক্ষাটা প্রথম দিনেই সে রাজী নয় দিতে।

জীবনবাবু তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'কিছু ঘাবড়াবেন না মশাই। কোন ভয় নেই আপনার। নৌকা যদি ডুবেও যায় আমরা আছি। আপনাকে পিঠে করে পার করে দেব।'

ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। বেশ মোটাসোটা চেহারা।

শ্যামল নিজের মনেই হাসল। উনি যদি জলে পড়েন, ওঁকে কে টেনে তুলবে। খেয়া নির্বিঘ্নে ওপারে গেল।

দুদিকে নীচু সবুজ ধানের ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। সে রাস্তা মাঝে মাঝে ভাঙা। উঁচু-নীচু।

জীবনবাবু বলতে লাগলেন 'সব চোর মশাই, সব চোর। মেরামতের জন্যে কতদিন হল টাকা স্যাংসনও হয়ে রয়েছে, কিন্তু সব কাগজ-কলমে। কে হাত লাগাচ্ছে বলুন, কার এত মাথা-ব্যথা।'

নিরিবিলি পথ, নির্জন মাঠ। যেদিকে তাকাও, দিগন্ত অবধি সবুজের সমারোহ। শ্যামলের মনে হল, সে যেন এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছে। ভুলে থাকবার মত, পালিয়ে থাকবার মত দেশ বটে। গাড়ীতে আসবার সময়ও খানিকটা অনুশোচনা অস্বস্তি ভোগ করছিল। চেনা নেই জানা নেই, কোথায় চলেছে কে জানে। কিন্তু নন্দীপুরে নেমে তার ভালোই লাগতে লাগল। যেন জীবনের নতন রস আর রহস্য তার জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে ধানের শীষে, মাঠের কাদায়, গাছগুলির পাতায় পাতায়।

খানিকটা পথ হাঁটতেই খান তিনেক ঘর দেখা গেল। টিনের ঘর। তাদের মধ্যে একটির দিকে জীবনবাবু আঙুল দেখিয়ে বললেন 'ওই আপনার স্কুল।'

এর মধ্যে গ্রামের আরও কয়েকজন ভদ্রলোক তাদের এগিয়ে নিতে এসেছিলেন।

জীবনবাবু একে একে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন, 'ইনি আমাদের হাসপাতালের ডাক্তার, ইনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ইনি ব্যবসায়ী। বাজারে তেল নুনের আড়ৎ আছে।'

তিনজন সহকর্মীর সঙ্গেও দেখা হল শ্যামলের। সবাই তার চেয়ে বয়সে বড়। কেউ এই গাঁয়ের অধিবাসী। কেউ পাশের গাঁয়ের বাসিন্দা। শ্যামল পরে জেনেছিল মাষ্টারীই তাঁদের একমাত্র জীবিকা নয়, হলে টিঁকে থাকতে পারতেন না। কারো ছোট-খাটো ষ্টেশনারি দোকান আছে। কেউ

বা পুরোহিত। তৃতীয়জন একই সঙ্গে পোষ্টমাষ্টার আর স্কুলমাষ্টার। পোষ্ট-অফিস স্কুলের পাশেই। তার লাগা একটি পাকা কুঠরী। তৈরীর কাজ এখনো শেষ হয়নি।

জীবনবাবু বললেন, 'এখানে আমাদের লাইব্রেরী হবে। সোশ্যাল ওয়েল-ফেয়ার বোর্ডকে অনেক লেখালেখি করে এইটুকু আদায় করেছি মশাই। সহজে কি আর কিছু দিতে চায় ওরা? আপনি এলেন। এবার গাঁয়ের শ্রী ফিরে যাবে। নিউ ব্লাড চাই মশাই, নিউ ব্লাড চাই। আমাদের মত বুড়োদের ঘুণ-ধরা রক্তে কোন কাজ হবে না।'

দক্ষিণ দিকে লম্বা একটি দীঘি। টল টল করছে জল। ঘাটলাগুলি পুরনো। জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে, ভেঙে গেছে। কিন্তু দীঘির জলে যে কয়েকটি শাপলা ফুটে আছে তা চির নতুন।

জীবনবাবু বললেন, 'প্রত্যেকবার ভাবি মশাই ঘাটলাগুলি নতুন করে বাঁধাব। কিন্তু হয়ে ওঠে না। এবার আপনি এলেন—।'

লাইব্রেরী-ঘরে শ্যামলের জিনিসপত্র রেখে জীবনবাবু শ্যামলকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়ি মানে এক ধ্বংসস্তূপ। ঢুকলেই ভয় করে। পাঁচিলগুলি ভেঙে পড়েছে। সখের বাগান এখন আগাছার অরণ্য।

জীবনবাবু দেখাতে দেখাতে চললেন, 'এই ছিল নাটমন্দির, এই কাছারি-বাড়ী, এই ছিল অতিথিশালা। সব ছিল। এখন আর কিচ্ছু নেই। সব কিংবদন্তী আপনি ভাবতে পারেন প্রাগৈতিহাসিক আমলের ব্যাপার। কিন্তু আমি নষ্ট করিনি মশাই। আমার বাবাই সব শেষ করে রেখে গেছেন। পাছে তাঁর ছেলের ঘাড়ে দোষ পড়ে।'

অত বড় বাড়িতে বাসযোগ্য ঘর আর নেই। দোতলায় খান দুই ঘর বোধ হয় নতুন করে মেরামত করে নিয়েছেন জীবনবাবু। জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তিনি বলতে লাগলেন 'দুঃখ করিনে মশাই, দুঃখ করে আর কি হবে। সংসারের নিয়মই তো এই।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥'

তাঁর উদাস গম্ভীরস্বরে মহাভারতের এই শ্লোক শুনতে শুনতে শ্যামলের গা ছমছম করে উঠল। জীবনের অন্তে যে মরণ, সিঁড়ি ভেঙে পড়ে এখনই তার প্রত্যক্ষ দর্শন না হয়ে যায়।

জীবনবাবু দোতলার ঘরখানির সামনে পৌঁছেই ডাকতে লাগলেন, 'যামিনী, যামিনী, নতুন হেডমাষ্টারকে নিয়ে এসেছি। দেখ এসে।'

পাশের ঘর থেকে একটি মেয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মামা, মা তো পূজোয় বসেছেন।'

জীবনবাবু বললেন, 'ও, পূজোয় বসেছে। আচ্ছা তুই আয়। আরে লজ্জা কি, আয় না। আমি যখন বলছি আয়। ভয় নেই। আরে আমি যাকে তাকে হুট করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসিনে। বুঝে শুঝেই আনি। আমাদের স্কুলের নতুন হেডমাষ্টার মশাই।'

ডাকাডাকিতে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। উনিশ কুড়ি বছর হবে বয়স। দীর্ঘাঙ্গী তন্বী। গায়ের রঙ মাজা গৌর। একটু লম্বাটে ধরনের মুখের ডৌল, যেমন কোমল তেমনি মিষ্টি। আর একটু আগে শ্যামল যে দীঘি দেখে এসেছে, ওর দুটি চোখ তেমনি শান্ত স্থির।

জীবনবাবু বললেন, 'আমার ভাগ্নী ঊষা। আর এঁর পরিচয় তো শুনলিই।'

ঊষা লজ্জিতভাবে হাত তুলে নমস্কার করল। প্রতি-নমস্কার করল শ্যামল। মনে মনে ভাবল ঊষা নামটাও ভালো। কিন্তু এর নাম হওয়া উচিত ছিল শকুন্তলা মিরাণ্ডা কি ডেসডিমোনা। যেমন ধ্বনি-মধুর ; তেমনি লাবণ্য-মধুর।

জীবনবাবু বললেন, 'আচ্ছা, তুই এবার যা। আমরা এ ঘরে বসি। বেলা হল। ওঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

স্কুলের কমিটি নামে মাত্র আছে। আসলে জীবনবাবুই সব। তাঁদেরই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত স্কুল। এক সময় বছর বছর স্কলারশিপ পেত। এখন পূর্বগৌরবের স্মৃতিটুকু শুধু আছে।

জীবনবাবু গোপনে শ্যামলকে বললেন, 'বি-এ, ফেল করেছেন, একথাটা পাঁচজনের কাছে বলে আর কাজ নেই। আরে পরীক্ষা দিলে তো সামনের বার পাশ করে যাবেন। পাশ-ফেল বারো আনি লাক।'

নতুন লাইব্রেরীর ঘরটায় এখনো বইয়ের আলমারি টালমারি আসেনি। সেখানে একটা তক্তপোশ পেতে রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন জীবনবাবু। তিনি বললেন, 'ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের বাড়িতে একটা ঘর নিয়েও থাকতে পারেন। ঠিক করে দিলেই হবে।'

শ্যামল বলেছিল, 'না না না, এখানেই ভালো।'

স্কুলের একটি বেয়ারা এসে সব বিছানাপত্র গুছিয়ে ঠিক ঠাক করে দিয়ে গেল।

জীবনবাবু একটা টর্চ রেখে গেলেন। বললেন, 'কোন ভয় নেই আপনার, এখানে চুরি ডাকাতি হয় না।'

তিনি চলে গেলে কী মনে পড়ল শ্যামলের। পকেট থেকে সকালের সেই শুকনো ফুলের মালাটা বালিশের পাশে রাখল। এখন আর কোন গন্ধ নেই। ফুলগুলিও ম্লান। কিন্তু এই অন্ধকার নিঃসঙ্গ রাত্রে মালাটা যেন ব্যঞ্জনার গৌরবে ভরে উঠেছে।

পরদিনই বড়দাকে চিঠি দিয়ে ঠিকানা আর সব কথা জানাল শ্যামল। মাফ চাইল। বড়দা রাগ করে জবাবই দিলেন না। ছোড়দা কড়া কড়া কথা লিখলেন। কিন্তু তাকে জোর করে ধরে নেওয়ার জন্যে এতদূর পর্যন্ত ছুটে এলেন না।

স্কুলের চার্জ বুঝে নিল শ্যামল। মাষ্টারমশাইদের জন্যে রুটিন ঠিক করে দিল। দুটো ক্লাসে সবশুদ্ধ শ'খানেক ছেলেও হয় না। নিচের ক্লাসগুলিতে ফ্রক-পরা কয়েকটি মেয়েও আসে।

জীবনবাবু বললেন 'আপনি ভাববেন না। কোন রকম ডিফিকালটি হলেই আমাকে বলবেন। আমি আপনাকে হেল্প করব। অফিস ওয়ার্কই হোক আর অ্যাডমিনিষ্ট্রেসনের কথাই হোক, সব জানা আছে।'

সবই জানা আছে জীবনবাবুর। তাঁর সবই ভালো। কিন্তু মাষ্টারমশাইদের মাইনে দেওয়ার বেলাতেই যত গণ্ডগোল। প্রথম মাসে শ্যামলের হাতে পঞ্চাশ টাকার বেশি দিতে পারলেন না তিনি। তার পরের মাসগুলিতে আরো কম দিলেন। কোত্থেকে দেবেন। ছাত্রদের মাইনেতো নিয়মিত আদায় হয় না। সব সর্ত মেনে চলেন না বলে সরকারের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া লেগেই আছে। এইড নিয়মিত আসে না। স্কুলটা তাঁর ব্যক্তিগত লোকসানের সম্পত্তি। শ্যামল বুঝতে পারল এই জন্যেই এখানে বাহিরের হেডমাষ্টার এসে কেউ থাকেন না। অন্য কোন সুযোগ সুবিধা পেলেই চলে যান। সহকারী মাষ্টারমশাইদের অন্য কোন গতি নেই, এখানেই ঘর সংসার তাঁরাই শুধু স্থায়ী হয়ে টিঁকে আছেন।

কিন্তু মাইনের জন্যে বিশেষ কোন ক্ষোভ রইল না শ্যামলের। সে তো আর এখানে বেশি মাইনে পাবে বলে আসেনি। এসেছে অজ্ঞাতবাস করতে। এসেছে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্যে দূরে সরে থাকতে।

কিন্তু এই সংসারে ইচ্ছা করলেই কি অনাত্মীয় অনাসক্ত অসম্পৃক্ত হয়ে থাকা যায়?

একটু একটু করে কীভাবে যে জীবনবাবুদের সঙ্গে হৃদ্যতার সূত্রে শ্যামল জড়িয়ে পড়ছিল, তা সে যেন নিজেও ভালো করে টের পাচ্ছিল না।

তার থাকবার ব্যবস্থা বাইরে হলেও খাবার ব্যবস্থা জীবনবাবু তাঁর বাড়ীর মধ্যেই রেখেছিলেন। তাঁর বোনই দুবেলা রাঁধেন। ঊষা মাকে সাহায্য

করে। জীবনবাবুর স্ত্রী তাঁর প্রথম যৌবনেই মারা গেছেন। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেননি। ছেলে-মেয়ে নেই। একটি ভাগ্নীর ওপরই সব স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। ঊষাই দুজনের নয়নের মণি। অন্ধকার জীবনে একমাত্র আশার আলো।

কিন্তু শ্যামল ভাবত এমন রাজলক্ষ্মীকে কি এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে মানায়। এই স্তূপের, এই গহ্বরের ভিতর থেকে ওর যে বেরোন দরকার। নইলে বিপুল পৃথিবীর আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতির আলো কী করে ওর মুখে এসে পড়বে।

ঊষার সেবায় যত্নে যত মুগ্ধ হতে লাগল শ্যামল এই চিন্তা তাকে তত বেশি করে পেয়ে বসল। যেন কারাগারে এক বন্দিনী রাজকন্যা কোন এক দুঃসাহসী রাজপুত্রের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে তাকে দ্রুতগামী সাদা-ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নিজের রাজ্যে চলে যাবে। রাজলক্ষ্মী করে বসাবে নিজের আধখানা সিংহাসনে। সে রাজপুত্র কে?

শ্যামলের মত সাধারণ স্কুলমাষ্টার বি. এ. ফেল ছেলে নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু রাজপুত্র না হতে পারলেও শ্যামল নিজের কর্তব্য ভুলে যায় না। ঊষার পড়াশুনোয় সে সাহায্য করে। এ বাড়িতে যে সে দুবেলা খায়, তা ছাড়াও সকালে বিকালে চা জল-খাবার যে ওঁরা তার ঘরে পাঠিয়ে দেন, তার তো একটা প্রতিদান দেওয়া চাই।

পড়াশুনো ঊষা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, শ্যামলের গরজে সে আবার আরম্ভ করে। বড় লজ্জা ঊষার। কিছুতেই সামনে বসে পড়ে না। দরকার পড়লে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নেয়।

প্রায়ই বলে, 'এই বয়সে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলে কি হয়?'

শ্যামল বলে, 'কেন হবে না? তুমি এমন কি আশি বছরের বুড়ী হয়ে পড়েছ?'

প্রথম প্রথম ঊষাকে আপনিই বলত শ্যামল, যামিনী আর জীবনবাবুর ধমকে তুমি বলতে শুরু করেছে। তাঁরাও শ্যামলকে তুমি বলেন, নাম ধরে ডাকেন।

ঊষা বলে, 'আশির দরকার নেই। বুড়ি হতে বাঙালী মেয়ের পক্ষে কুড়িই যথেষ্ট।'

যামিনী প্রতিবাদ করে ওঠেন, 'তোর তো কুড়ি এখনো হয়নি। সবে উনিশে পড়েছিস। তোর সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।'

ঊষা সরে গেলে যামিনী নালিশ করতে থাকেন, 'দাদার খামখেয়ালের জন্যেই সব গেল। কিছুতেই ওকে বাইরে বেরোতে দিলেন না, অন্য কোথাও

গিয়ে থাকতে দিলেন না। নইলে ওর বয়সী মেয়েরা এখন আই-এ, বি-এ, পড়ে। সবই আমার অদৃষ্ট।'

যামিনীর আরও খারাপ অদৃষ্টের কথা থার্ডমাষ্টার মশাইর কাছে শুনেছে শ্যামল।

অল্পবয়সে দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। ছেলেটি এই কাঞ্চনা নদীতেই জলে ডুবে মারা গেছে। মেয়েটির ভালো একটি সম্বন্ধ এসেছিল। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। ভদ্রলোক রেলে ভালো চাকরি করতেন। নিজেই দেখে শুনে কনে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। সব ঠিকঠাক। হঠাৎ ছেলেটি সন্ন্যাসরোগে মারা গেল। আজকাল যেন ইংরেজীতে কী বলে 'থ্রম্বসিস'। অথচ ও রোগে তো বুড়োরাই মরে শুনেছি। সে ভদ্রলোকের বয়স তো এমন কিছু হয়নি। তিরিশ বত্রিশ। কিছুতেই পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। সেই থেকে অপয়া বলে মেয়েটির দুর্নাম রটে গেছে। সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে ভেঙে যায়। থাকে ওবকম দু'একটি মেয়ে।'

শ্যামল জোর গলায় বলেছিল, 'আমি ওসব বিশ্বাস করিনে।'

থার্ডমাষ্টার তাঁর মোটা গোঁফের আড়ালে মিটি মিটি হেসেছিলেন। কী ভেবে হেসেছিলেন কে জানে।

গ্রামের জীবনে যেমন কোন যানবাহনের স্রোত ছিল না, তেমনি ঘটনা-স্রোতও খুবই ক্ষীণ ছিল। গ্রামের লোক বেশি নয়। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগই চাষী। আর পূর্ববঙ্গ থেকে কয়েক ঘর কুমোর এসেছে। তারা বড় বড় গামলা তৈরি করে, পাটকেলে রঙের কুয়োর চাঙগুলি টান দিয়ে তাদের উঠানে সাজিয়ে রাখে। শ্যামল যখন বেড়াতে বেরোত, কারো সঙ্গে দেখা হলেই 'নমস্কার মাষ্টারমশাই' বলে সবাই তাকে সম্মান জানাত। শুধু স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের মুখেই নয়, প্রবীণ সহকর্মীদের মুখে বয়স্থ অভিভাবকদের মুখে মাষ্টারমশাই ডাকটা প্রথম প্রথম শ্যামলের ভারি অদ্ভুত লাগত। সে যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে মাষ্টারি করছে। কিন্তু ছেলে বুড়ো সবারই শ্রদ্ধা তাকে বিস্মিত করত, অভিভূত করত। কলকাতার একটি ফেল-করা অযোগ্য অনাদৃত ছেলেকে তারা কী সম্মানই না দেখাচ্ছে। এখানে সে হেড অব দি ইনষ্টিটিউসন। তার বয়স যত অল্পই হোক, তার বিদ্যাবুদ্ধি যত কমই থাকুক, তার এই প্রতিষ্ঠান যত ছোটই হোক শ্যামল এখানে প্রধান।

স্কুলের লাগা যে ছোট্ট পোষ্ট-অফিস আছে, শ্যামল রোজ এসে তার জানলার সামনে দাঁড়াত, ভিতরের পোষ্টমাষ্টার তারই স্কুলের সহকর্মী।

তিনি শ্যামলকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেন, 'আসুন মাষ্টারমশাই ভিতরে আসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন।'

শ্যামল হেসে বলত, 'না না, এই ভালো। আমার কোন চিঠিপত্র আছে নাকি শশাঙ্কবাবু?'

তাঁর জবাব কোনদিন ইতিবাচক হত, কোনদিন নেতিবাচক।

শ্যামলের কলকাতার বন্ধুরা প্রথম দিকে খুব চিঠিপত্র লিখত। বাড়ির দিদি বউদিরাও কিছু কিছু লিখেছেন। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই প্রত্যেকের উৎসাহেই যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। চিঠি দিয়েও শ্যামল আর কারো কাছ থেকে সহজে জবাব পায় না।

শ্যামল লক্ষ্য করল সবাইর নামেই চিঠিপত্র আসে, আসে না শুধু উষা বসুরায়ের নামে।

শ্যামল একদিন জিজ্ঞাসা করল 'তোমাকে কেউ চিঠি লেখে না?'

উষা বলল, 'আমাকে আবার কে লিখবে?'

'লিখবার কেউ নেই?'

'না।'

পরের সপ্তাহ থেকে উষার নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত আসতে লাগল।

খাওয়ার পরে এলাচ লবংগ না হয় একটু সুপুরির কুচি উষা রোজ শ্যামলের হাতে তুলে দেয়। আজও তাই দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলল, 'কেন এ কাণ্ড করলেন বলুন তো। লোকে কি ভাববে।'

শ্যামল বলল, 'এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কি আছে?'

উষা চোখ নামিয়ে বলল, 'না না আমার বড় লজ্জা করছে।'

শ্যামল ওর মুখের ভাব দেখে বুঝল শুধু লজ্জা নয় গৌরবেও উষার মন ভরে উঠেছে।

যে কিছুই পায় না সামান্য প্রাপ্তিও তার কাছে অসামান্য।

মালিনীও শুনে রাগ করতে লাগলেন 'কেন তুমি অত টাকা নষ্ট করলে। ছ'মাসের চাঁদা তো কম নয়। আগে কত কাগজ আসত আমাদের বাড়িতে। কত বই পত্তর। তার আর সীমা সংখ্যা ছিল না। কিন্তু দাদা বসে বসে সব নষ্ট করল। একটা জীবন একেবারে ঠায় বসে কাটাল। বসে খেলে কুবেরের সম্পত্তি শেষ হয়ে যায় বাপু। আর এ তো সামান্য ছিটে-ফোঁটা। কেবল জল্পনা কল্পনা, কেবল এই করব আর সেই করব। ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রামসংস্কার– কিছুই করতে আর বাকি রাখেনি। সবই হয়েছে।'

জীবনবাবুর জল্পনা-কল্পনার কথা শ্যামলও কম জানে না। কখনো

পোস্ট-অফিসের বারান্দায় বসে, কখনো শ্যামলের ঘরে গিয়ে তার তক্তপোশের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে তিনি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। কোনদিন রাস্তা, কোনদিন বড় হাসপাতাল, কোনদিন হাইস্কুল, কোনদিন লাইব্রেরী তাঁর উদ্দীপনার বিষয় হয়। এ গ্রামে সবই গড়ে তুলতে হবে, সবই চাই। কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু নিউ ব্লাডের।

'বুঝেছ মাষ্টার, New blood and new idea. I always welcome them.'

কিন্তু শ্যামল লক্ষ্য করেছে গ্রামের যুবকেরা তাঁর কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। সবাই জীবনবাবুকে এড়িয়ে যায়। আড়ালে আবডালে বলাবলি করে ওঁর মাথায় ছিট আছে। দেশোন্নতির ছিট।

শ্যামলও ওঁর জল্পনা-কল্পনাকে বেশি আমল দেয় না। স্কুলের কাজের পর যতটা সময় পায়, নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকবার চেষ্টা করে। পরীক্ষা তো আবার আসছে। মাঝে মাঝে ডাকে কিছু কিছু বইপত্র আনিয়ে নেয়। সহজে বৈতরণী পার হবার মত নতুন নোটবুক আর মেড-ঈজি কিছু বেরোল কিনা কলেজে আর কলেজ ষ্ট্রীটের পাবলিশারদের কাছে চিঠিপত্র লিখে তার খোঁজ করে।

জীবনবাবু বসে থেকে থেকে এক সময় উঠে পড়েন, 'এবার যাই মাষ্টার। আর তোমাকে ডিষ্টার্ব করব না। তোমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর উঠে-পড়ে দুজনে মিলে লাগা যাবে। তোমাকে যখন পেয়েছি, সহজে ছাড়ব না। এই স্কুলকে আমি হাইস্কুল করবই। তুমিও এম-এ পাশ করবে, বি-টি পাশ করবে। এই স্কুলই তোমার সব খরচ চালাবে। তারপর—।'

একদিন নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল শ্যামল। সাইকেলে করে হাসপাতালের ডাক্তার মধুবাবু কোথায় যাচ্ছিলেন, তাকে দেখে নেমে পড়লেন।

'এই যে মাষ্টারমশাই, ভালো তো সব?'

শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ।'

তিনি কথা বলতে বলতে শ্যামলের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন।

নদীর স্রোতে কচুরিপানা কিভাবে ভেসে যাচ্ছে, শ্যামল তাই লক্ষ্য করছিল। তিনি হঠাৎ বললেন, 'চৌধুরীদের সঙ্গে আপনার বুঝি খুব খাতির হয়েছে?'

শ্যামল বলল, 'খাতির আর কি—।'

মধুবাবু বললেন 'বেশি ঘনিষ্ঠতা করবেন না মশাই। ভদ্রলোক বাইরে ন্যালা-ভোলা সেজে থাকেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শয়তান। আমার নামে সদরে রিপোর্ট করেছে। ওরা তিন-পুরুষ আগেও নাকি ডাকাত ছিল।

অন্ততঃ প্রজাদের ওপর দিয়ে ডাকাতি তো চালিয়েইছে। তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন। সংসারে কোন অধর্মই সয় না শ্যামলবাবু। আমার নামে রিপোর্ট করে ঘোড়ার ডিম করবে। আপনি কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান! ওরা ইচ্ছে করলে এখনো মানুষকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে পারে।'

শ্যামল শুনে হেসেছিল। আর যার সঙ্গেই থাক, তার সঙ্গে চৌধুরী মশাইয়ের কোন শত্রুতা নেই। শ্যামলকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। তাছাড়া চুরি-ডাকাতি করে নেবার মত তার কি-ই বা আছে।

এর মাস তিনেক পরে যামিনী শ্যামলের কাছে প্রস্তাবটা করেছিলেন। তাদের সেই বাগানের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তিনি শ্যামলের পড়াশুনো আর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ শ্যামল, তুমি নাকি ওই রাক্ষুসীর ধারে প্রায়ই ঘুরে বেড়াও?' শ্যামল বিস্মিত হয়ে বলেছিল 'রাক্ষুসী আবার কে?' তিনি বলেছিলেন, 'ওই যে সর্বনাশী নদীটা। আমাদের বাগানের পিছন দিয়ে খিল খিল করে হেসে চলেছে। সংসারে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে। পরের ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে যে রাক্ষুসী। ও তো হাসবেই, সেই থেকে আমি তো আর ওর জল ছুঁইনে। ওর জলে চানও করিনে, রান্নাও করিনে। আজ চোদ্দ বছর হয়ে গেল। বেঁচে থাকলে তোমার মতই হত এতদিনে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। হরীতকী আর আমলকিগুলি কুড়োতে কুড়োতে চললেন যামিনী। কুড়িয়ে কুড়িয়ে আঁচল ভরে ফেললেন। ঘন জঙ্গল। চারদিকে কেউ কোথাও দেখবার নেই। শ্যামলের মনে পড়ল ঊষাকে নিয়েও তিনি একদিন এসেছিলেন। আজ আর তাকে আনেননি।

বড় পাকা টলটলে মুক্তার মত একটি ফল তিনি শ্যামলের হাতে তুলে দিয়ে হেসে বললেন,—'নাও। তুমি তো আমলকি খুব ভালোবাসো।'

একটু চুপ করে থেকে তারপর তিনি বলেছিলেন, 'আর একটা কথা তোমাকে বলব শ্যামল। আমার ঊষা তোমাকে খুব ভক্তি করে। গোপনে গোপনে ও তোমার গেঞ্জি কেচে দেয় রুমাল কেচে দেয়। জামা ইস্ত্রি করে। এমন সে আর কারো করেনি। মা হয়ে আর কী বলব তোমাকে। দাদা ওর যে সম্বন্ধটা এনেছেন সেটা ওরও পছন্দ নয়, আমারও পছন্দ নয়। শুধু কুলীন দিয়ে কী হবে। আমি কুলীনটুলিন কিছু চাইনে। শুধু তোমার মত একটি ছেলে চাই। নেবে তুমি আমার ঊষার ভার? তুমি যদি মুখ ফুটে বলো আমি দাদাকে রাজী করতে পারব। তাছাড়া দাদাও ভিতরে ভিতরে তোমাকে—।'

শ্যামল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল,—'একী অসম্ভব কথা বলছেন মাসীমা?'

যামিনীর মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'অসম্ভব কেন বলছ শ্যামল?'

শ্যামল বলল, 'অসম্ভব নয়? আমার সব দাদার এখনো বিয়ে হয়নি। আমার হোল ক্যারিয়ার এখনো সামনে পড়ে আছে। আমি যদি এখনই—। না না না, তা হয় না মাসীমা।'

যামিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তাহলে আমারই ভুল হয়েছিল। আর একটা অনুরোধ বাবা। একথা যেন কাক পক্ষীও আর না জানতে পারে। আর আজকের রাতটা তুমি ভালো করে ভেবে দেখ। তোমার পড়াশুনোর কোন বাধা হবে না, চাকরিবাকরির চেষ্টারও কোন বাধা হবে না। তুমি শুধু—। ভেবে দেখ। ভেবে আমাকে বোলো।'

ভেবেছিল বইকি। সারারাত্র না ঘুমিয়ে ভেবে ভোর করেছিল শ্যামল। একবার তার মনে হয়েছিল এর চেয়ে বাঞ্ছিত জীবন আর কী আছে? একটি পরম সুন্দরী পরম রমণীয়া নমনীয়া নারী আর তার অগাধ ভালোবাসা। তার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন বস্তুর বিনিময় হয়? তা ধনের চেয়ে বড়, মানের চেয়ে বড়, জীবনের সব সার্থকতার চেয়ে বড়।

কিন্তু শ্যামলের যুক্তিবাদী আর একটি তার্কিক মন হেসে উঠেছিল, 'তাহলে তোমার এখানেই শেষ। সেই মধু ডাক্তার যা বলেছে—এই ভগ্নস্তূপের মধ্যেই জীবন্ত সমাধি। জীবনবাবু কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দেবেন না। তোমার মানসিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এখানেই তোমাকে আটকে রাখবেন। দীর্ঘ জীবন তো শুধু একটি ফুল নয়, একটি বসন্তকাল নয়। এমন কি, শুধু একটি যৌবনের সঙ্গেও তাকে অঙ্গাঙ্গী করা যায় না। যৌবন গেলেও তার জের চলে। যেমন চৌধুরী মশাইর চলেছে।'

মাসীমাকে নতুন কথা কিছু আর বলতে পারেনি শ্যামল। পরীক্ষার অজুহাতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে চলেছে। আশ্চর্য, ছেলেরা এবারও তাকে ফুলের মালা পরিয়ে বিদায়-অভিনন্দন জানিয়েছে। এমন হেডমাষ্টার নাকি তাদের স্কুলে আর আসেননি।

জীবনবাবু এই ঘটনার কতটুকু জেনেছেন বুঝেছেন, শ্যামলকে তা বুঝতে দেননি। দল বল নিয়ে শ্যামলকে তিনি এবারও ষ্টেশন পর্যন্তই এগিয়ে দিয়েছেন।

বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলবার জন্যেই বোধ হয় সারাটা পথ আবৃত্তি করতে করতে এসেছেন।

'দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—'

ছাত্রদের দেওয়া মালাটা কিন্তু শ্যামল পথে ফেলে দিয়ে আসেনি। সার্টের ঝুল পকেটে কবে লুকিয়ে নিয়ে চলেছে। এ মালা যে কার গাঁথা, তা সে নিশ্চিতভাবে জানে না। কিন্তু যে অত ফুল তোলে, ফুল ভালোবাসে, ফুল দিয়ে ঘর সাজায় ফুলদানিগুলি ভরে রাখে, নিজের খোঁপায় পরে -এই বিদায়-বেলার মালা তার হাতের গাঁথা হতেও পারে।

গাড়ি আর একটা ছোট ষ্টেশনে এসে থামল। অর্থহীন হৈ চৈ কোলাহল, হাক ডাক। কিন্তু শ্যামল এবার অনড় অচঞ্চল হয়ে রইল। সহযাত্রীরা কেউ আর তার সমালোচনা করতে পারবে না।

॥ অনাহূত ॥

শরীরটা ভালো নেই, মাথাটাও একটু যেন ধরেছে। সুধাময় তাই ভেবেছিল টিফিনের সময় আজ আর বেরোবে না, সীটে বসেই চা টা যা খাবার খেয়ে নেবে। কিন্তু ননীদার জ্বালায় তা কি পারবার জো আছে? সামনের টেবিল থেকে উঠে এসে সুধাময়কে সে জোর করেই টেনে তুলল, 'চল চল, ক্যানটিন থেকে একটু ঘুরে আসি।'

সুধাময় বলল, 'কেন, তোমার সেই পেটেন্ট কৌটোটি কোথায়? বউদি আজ খাবার-টাবার কিছু করে দেননি?'

ননীগোপাল কথায় মধ্যে গূঢ় রহস্যের আমেজ এনে বলল, 'আরে, বউদি কি আজ আর সেই বউদি আছে?'

'কেন, কী হয়েছে বউদির?'

ননীগোপাল বলল, 'চল, যেতে যেতে বলব।'

পাশেই ক্যানটিন। সরকারী অফিসের কেরানীকুলে গিজ গিজ করছে। বেসরকারী অফিসেরও যে কেউ এসে ঢুকে পড়েনি তা নয়। এখানে খাবার-টাবারগুলি ভালোই হয়। কেউ বা বন্ধুর আমন্ত্রণে এসেছে, কেউ বা নিজের পকেটের জোরে। মিলবার কথা না, তবু জানলার ধারে দুটি চেয়ার সাঁতাই মিলে গেল। ননীগোপাল অকাতরে চা-টোস্ট-অমলেটের অর্ডার দিয়ে ফেলল। সুধাময়ের মনে হল, মাথাধরাটা এবার যেন ছাড়ি-ছাড়ি করছে। দেহটা বোধহয় ফের আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। মনের সঙ্গে যে শরীরের একটা নিত্যসম্বন্ধ আছে, সুধাময়ের মনে হল সেকথা সত্যি। আসলে বন্ধুর কাছে মানুষ যে শুধু খেতেই চায় তা নয়, আদর-আপ্যায়ন অনুরাগ-ভালোবাসা পেতে চায়। সেইটুকুও কত দুর্লভ। ননীদার মেজাজ আজ বেশ ভালই আছে দেখা যাচ্ছে। অন্য দিন যেচেও যা পাওয়া যায় না, আজ অযাচিত ভাবে সেই চা-টোস্ট-অমলেট জুটে গেছে।

চামচেয় করে অমলেটের টুকরো মুখে তুলতে তুলতে সুধাময় বলল, 'হ্যাঁ, বউদির কী হয়েছে বলছিলে?'

ননীগোপাল বলল, 'কী আর হবে! বোনের বিয়ে। সেই অজুহাতে দুদিন ধরে খড়দয় গিয়ে পার হয়ে রয়েছে। আমি এখন নিজের ঘরে পরবাসী। শুধু ঝি ভরসা।'

সুধাময় হেসে বলল, 'তুমিই বা পরবাসী হয়ে রয়েছ কোন্ দুঃখে?

দুদিনের ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেই পারতে।'

ননীগোপাল বলল, 'তা আর পারলাম কই? ঝামেলা কি আর দুটো একটা? এই তো ছোট শালীর বিয়ের সঙ্গে অঞ্জুর বিয়ে ক্ল্যাশ করে গেল। দুই বিয়েই আজ রাত্রে একই লগ্নে। কোথায় খড়দ, আর কোথায় টালিগঞ্জ! কী করে ম্যানেজ করি! তাই রাত্রির নিমন্ত্রণ অঞ্জুদের ওখান থেকে সকালেই সেরে এলাম। মাসীমা কিছুতেই ছাড়লেন না। ওখান থেকে নেয়ে খেয়ে তবে অফিসে বেরিয়েছি।'

সুধাময় ঢোঁক গিলে বলল, 'কোন্ অঞ্জুর কথা বলছ? অঞ্জলি? অঞ্জলি সোম?'

ননীগোপাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যার কাছে তুমি এতকাল কৃতাঞ্জলি হয়ে ছিলে। এখন যে একেবারে চিনতেই পারছ না। তবু তো বিয়েটা এখনো হয়ে যায়নি। হ্যাঁ, তুমি কখন যাচ্ছ? অফিস-ফেরৎ সোজা চলে যাচ্ছ তো?'

সুধাময় স্তব্ধ হয়ে রইল। টোস্ট-অমলেট এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু আহারের প্রবৃত্তিটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। চায়ে স্বাদ নেই, টোস্টে স্বাদ নেই, অমলেটে স্বাদ নেই, পৃথিবীর যাবতীয় ভোজ্য-পানীয় এক কটু-স্বাদে বিষাক্ত হয়ে রয়েছে।

কে যেন চামচ দিয়ে তার জিভটিকে চেপে ধরেছে। অতিকষ্টে তার হাত ছাড়িয়ে সুধাময় কোনরকমে বলতে পারল, 'না ননীদা, আমি তো কিছু জানিনে। ওরা আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করেনি।'

ননীগোপাল বন্ধুর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'দূর, তাই কি হয়? বিজয়বাবুদের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা, আর ওঁরা তোমাকে মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করবেন না এও কি একটা কথা হল? নিশ্চয়ই ডাকের গোলমাল– তাছাড়া যে ভুতুরে মেসবাড়িটায় তুমি থাক, সেখানে সামান্য একখানা চিঠি তো ভাল, গোটা একটা পোস্ট অফিসও উধাও হয়ে যেতে পারে।'

কিন্তু এসব কথা একেবারেই ফাঁকা কথা, তা কে না বোঝে? সুধাময়ও সব বুঝতে পেরে চুপ করে রইল। ননীগোপাল সিংও চালাক কম নয়। অবস্থা বুঝে সে অফিস ক্লিক নিয়ে আলোচনা শুরু করল। বিবাহ-প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না। না শালীর বিয়ের, না অঞ্জলির বিয়ের। কিন্তু অফিসের দল-উপদলের, ডিপার্টমেণ্টাল হেডের পক্ষপাতের ব্যাপারে এই মুহূর্তে সুধাময় দত্তের কোন কৌতূহলই নেই। যেমন রুচি নেই আর

অবশিষ্ট খাদ্যবস্তুতে। কিন্তু ননীদার পয়সায় কেনা জিনিস নষ্ট করলে সে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না, তাই মুখে না রুচলেও সবই সুধাময়কে খেতে হল। কিন্তু খাওয়ার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করল না সুধাময়।

'চল যাওয়া যাক।' বলে উঠে দাঁড়াল।

ননীগোপাল বলল, 'আরে এখনই কি! এখনও তো দশ মিনিট সময় আছে হে।'

সুধাময় বলল, 'থাক। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

অগত্যা ননীগোপালও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ব্যাপার কি হে? অঞ্জলির বিয়ের কথা শুনতে না শুনতে তুমি যে একেবারে মুষড়ে পড়েছ সুধাময়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন এখন শুধু অন্তর্জলিটুকুই বাকি। তোমাদের মধ্যে সত্যিই তাহলে অঘটন-টঘটন কিছু ঘটেছিল নাকি?'

সুধাময় অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল 'আঃ থামো! বাজে ইয়ার্কি দিয়ো না। সব সময় তোমার ওই বস্তাপচা রসিকতা ভাল লাগে না ননীদা।'

ননীগোপাল আড়চোখে আর একবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে সুধাময়কে দিল। দ্বিতীয়টি নিজে ধরিয়ে মুচকি হেসে বলল, আজ তোমার কী হয়েছে সুধাময় বলো তো? বেশি বয়েস অবধি বিয়ে না করলে কি ডিসপেপসিয়ায় ভুগলে মানুষের এমন তিরিক্ষে মেজাজ নির্ঘাৎ হবেই হবে। দেখি, শালীর বিয়ের ব্যাপারটা আজ ভালয় ভালয় মিটে যাক। কাল থেকে তোমার বিয়ের ঘটকালিটা ফের নতুন করে শুরু করব। কাজটা আর ফেলে রাখলে চলবে না দেখছি।'

সহকর্মী বন্ধুর এই ভাঁড়ামি আর ভড়ং এই মুহূর্তে অসহ্য লাগতে লাগল সুধাময়ের। কিন্তু মুখ বুজে সে সবই সয়ে গেল। তার যে আজ সইবারই পালা। শুধু কি আজ? চিরটা কালই তাই। জীবনভর একই জপমন্ত্র। সয়ে যাও সয়ে যাও। বন্ধুদের উপহাস-পরিহাস সহকর্মীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, আত্মীয়-স্বজনের প্রতারণা আর নারীজাতির ছলনা-বঞ্চনা সব সয়ে যাও। যদি সইতে না পার তারস্বরে চিৎকার কর, দাঁতে দাঁত ঘষো, মাথার চুল ছিঁড়ে সীন ক্রিয়েট করে লোক হাসাও। তোমার সামনে মাত্র এই দুটি বিকল্পই আছে যেটি হয় বেছে নাও।

অফিসে ঢুকে সুধাময় শান্তভাবে চেয়ারটিতে এসে বসল। ননীগোপালও নিজের সেকসনে ফিরে গেল। খানিক বাদে সুধাময়ের মনে হত লাগল মাথাটা আরও বেশি করে ধরেছে। তখন এক দিকটা ধরা ধরা মনে হচ্ছিল,

এখন দুদিকেই দুটো রগ লাফাচ্ছে। কিন্তু পীড়াটা যেন শুধু শিরের নয়, প্রতিটি শিরায় শিরায় এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছে।

ফাইলের ফিতা খুলল সুধাময়। জরুরী চিঠিগুলির জবাব দেওয়ার জন্য তোড়জোড়ও করল। কিন্তু কলম যেন আর চলে না। গোটা চিঠির মুসাবিদা তো দূরের কথা, ইংরেজী ভাষার একটা পুরো সেনটেন্সও মাথায় আসে না। অথচ ইনচার্জের কাছে কয়েকটি ড্রাফট পাঠাতেই হবে। তিনি সেই মুসাবিদা অনুমোদন করলে টাইপিস্টদের ঘরে যাবে। অথচ সৈন্য-বাহিনীর খাদ্যবস্ত্র, সাজ-সরঞ্জামের হিসাব-নিকাশের সঙ্গে সুধাময়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন সম্পর্কই নেই। তবু প্রাণপণে সে একটি চিঠির মুসাবিদা খাড়া করবার চেষ্টা করতে লাগল।

ছুটির দুঘণ্টা আগে ইনচার্জকে জরুরী কাজের কথা বলে ননীগোপাল বেরিয়ে গেল। সুধাময়ের বেরোবার দরকার আরো বেশি। এত যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করা যায় না। পদে পদে ভুল করার ভয় থাকে। তবু সুধাময় চেয়ারে চেপে বসে রইল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা মাত্র করল না।

হল-ভরা সহকর্মীরা কাজ করছে। ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে, গল্প করছে। সুধাময় শুধু মুখ বুজে রইল। 'সহ্য কর' এই মূল মন্ত্র থেকে বিন্দুমাত্র সরে গেলে তার চলবে না। যারা শক্তিমান, তারা নিজেদের চারদিকের পরিবেশকে বদলায়, তৈরি করে, সৃষ্টি করে—আর যাদের সেই শক্তি নেই তারা পরিবর্তিত হয়, চক্রনেমির মত আবর্তিত হয়, সহ্য করা ছাড়া তাদের গতি নেই। সুধাময় নিজেকে ভালো করেই জানে। সে এই দ্বিতীয় সারির মানুষ। আর তার সহকর্মী বন্ধু ননীগোপাল সিং প্রথম সারির লোক। সুধাময়ের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান, শক্তিমান পুরুষ ননীগোপাল। যদিও অফিসে সুধাময়ের মতই সে একজন গ্রেডের ক্লার্ক মাত্র, তবু অনেকের সঙ্গেই তার জানাশোনা, দহরম-মহরম। চাল-চলনে আদব-কায়দায় কথাবার্তায় সাধারণ কেরানী বলে ননীগোপালকে ধরবার জো নেই। কী করে ধরা যাবে? সে তো আর সুধাময়ের মত মেসের ভাড়াটে নয়, ধার-দেনা করে বোনের বিয়ে দেয়নি, সুদূর পাড়াগাঁয়ে বিধবা মা আর তিনটি ভাইবোনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাকে বয়ে বেড়াতে হয় না। ননীগোপাল তার সহকর্মী হলেও তার ভাগ্য অন্যরকম। বাপের একমাত্র ছেলে। সুবিবেচক সেই ভদ্রলোক ছেলের ঘাড়ে কোন বোঝা চাপিয়ে যাননি। বউবাজারে একটি আস্ত বাড়ি রেখে গেছেন। সেই বাড়ির একতলাটা ভাড়া দেয় ননীগোপাল। দোতলায় নিজেরা থাকে। তাই একই অফিসে একই গ্রেডে কাজ করলেও ননীগোপালের সঙ্গে সুধাময়ের কোন তুলনা হয় না। ননীগোপাল তারই

বয়সী। বরং দু-এক বছরের বড়ই হবে। অন্তত দু-তিন বছর আগে চল্লিশ পেরিয়েছে ননীগোপাল। বাপ অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারই জের টেনে টেনে পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছে। কিন্তু তার চাল-চলন দেখে কে না বলবে সে চিরকুমার? ভারি চতুর ননীগোপাল। একটু একটু সবই জানে। গাইতে জানে, তবলায় ঠেকা দিতে জানে, ভাল খেলতে জানে। মেয়েদের কী করে মন জোগাতে হয়, স্ত্রীর মন জুগিয়ে জুগিয়ে ননীগোপাল সে বিদ্যায় হাত পাকিয়েছে। স্ত্রী আছে বলে সুবিধেও আছে ননীগোপালের। আত্মীয়-কুটুম্ব তস্য কুটুম্বের শাখা-প্রশাখা ওর শহর ভরে ছড়ানো। স্ত্রীকে পাসপোর্টের মত সঙ্গে রেখে বহু পরিবারে ননীগোপালের আনাগোনা। দুদিন বাদে আর দরকার হয় না। চেনা বামুনের যেমন দরকার হয় না পৈতার। ননীগোপাল নির্ভয়ে নিঃসংকোচে অন্দরমহলে আসর জমিয়ে বসে। আত্মীয়-কুটুম্বদের তরুণী মেয়েদের নিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরতেও দেখা যায় ওকে। চা খায়, সিনেমা দেখে, জাদুঘর চিড়িয়াখানা কি কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দল বেঁধে হৈ-চৈ করে। সুধাময় একদিন বলেছিল, 'মেয়েরা তোমাকে খুব ভালবাসে ননীদা।'

ননীগোপাল হেসে জবাব দিয়েছিল, 'হিংসে হচ্ছে বুঝি? কিন্তু হিংসের কিছু নেই রে ভাই! এ ঠিক ভালবাসা নয়, বিশ্বাস। জানে যে, নখদন্তহীন জন্তু, তাই কাছে এগোতে ওদের আর ভয় নেই। স্ত্রীও নিশ্চিন্ত। জানে যে খুঁটোয় বাঁধা গরু। যতই আঁকু পাঁকু করুক, গণ্ডীর মধ্যেই চরে খাবে। বেশি দূর আর যেতে পারবে না। বরং তোমাকে দেখেই হিংসে হয়। এই বয়সেও দিব্যি কুমার কার্তিকেয়। বাঁধন-ছাদন কিছু নেই। লাইন একেবারে ক্লিয়ার। জীবনটাকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। যাকে ইচ্ছে তাকেই সর্বস্ব ধরে দিতে পার। আমার তো আর সে উপায় নেই। আমি এখন মর্টগেজী সম্পত্তি।'

সুধাময় বলেছিল, 'তুমি বলছ যাকে খুশি দিতে পারি। কিন্তু দিতে হলে ছায়ারূপিনীদের দিতে হয়। মাঝে মাঝে সিনেমার পর্দায় যে সব ছায়াকে দেখি। কি দেশবিদেশের লেখকেরা অক্ষরে অক্ষরে যাদের গড়ে তুলেছেন, সেই অক্ষরদেহিনীদের মনপ্রাণ সমর্পণ করতে হয়। তাদের ছাড়া আর কারও সঙ্গেই আমার কোন পরিচয় নেই।'

ননীগোপাল হেসে বলেছিল, 'আহা বেচারা ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ! এক কাজ কর। তুমি আমাকে আশ্রয় কর। মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ মদাপজী মাং নমস্কুরু।'

সুধাময় বলেছিল, 'একবার কেন, তোমাকে হাজারবার নমস্কার করি ননীদা। যা ওস্তাদ পুরুষ তুমি।'

ননীগোপাল বলেছিল, 'ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। সব ছাড়তে হবে। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

সুধাময় বলেছিল, 'শরণও না হয় নিলাম, কিন্তু তাতে লাভ কী!'

ননীগোপাল জবাব দিয়েছিল, 'লাভ! আমার অধীনে যে ষোলশো ব্রজাঙ্গনা আছে তাদের মধ্যে আটশো তোমাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান করব।'

সুধাময় হাতজোড় করে বলেছিল, 'মাফ কর ননীদা, তোমার আটশো ব্রজাঙ্গনা তোমারই থাক। ওতে আমার লোভ নেই। একটিই জোটে না, তার আবার আটশো।'

অঞ্জলি সোম ননীদার সেই ষোলশো ব্রজাঙ্গনার একজনা। জ্যেঠতুতো ভাইয়ের মাসতুতো শালী। সম্পর্কটা দূরের। বউবাজার থেকে টালিগঞ্জ চারু অ্যাভিনিউও শহরের ব্যস্ত মানুষের পক্ষে খুব নিকটের নয়। কিন্তু তাতে ননীগোপালের কোন অসুবিধা হয়নি। সে বলেছে, 'দূর, এইটুকু দূর আবার দূর নাকি! একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ের সান্নিধ্যের জন্যে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি। আর টালিগঞ্জ তো টালিগঞ্জ!'

ননীগোপালের মুখে কিছু আটকায় না। সুধাময় কিন্তু এ কথা শুনে লজ্জায় মুখ তুলতে পারেনি। ছি ছি ছি. এমন অশালীন, অভদ্র ধরনের কথাবার্তা বলতে পারে ননীদা। সুধাময় লক্ষ্য করে দেখেছে, যারা অবিবাহিত তাদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষের মুখ বেশিরকম আলগা। শুধু পুরুষ কেন মেয়েরাও নাকি এ নিয়মের বাইরে নন। অবশ্য এ কথা সুধাময় শুনেছে। কি কোন বইতে পড়ে থাকবে। বিবাহিতাই হোক আর অবিবাহিতাই হোক ননীদার মত এমন অনর্গলভাষী মহিলাকে সে আজ পর্যন্ত দেখেনি।

ননীগোপালের সঙ্গে সুধাময় সিনেমা-থিয়েটারে গেছে, খেলার মাঠে গেছে. সস্তা-দামী দেশী-বিদেশী অনেক রেস্টুরেণ্টে বসে খেয়েছে, গল্প করেছে. কিন্তু তার অনুরোধ সত্ত্বেও কোন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে যেতে সুধাময় সহজে রাজী হয় নি। এমনকি ননীদার নিজের বাড়িতেও সে বছরে দু-একবারের বেশি যায় না। কোন পরিবারের মধ্যে গেলে সুধাময় যেন তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। পারিবারিক মানুষ নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বড় বেশি পরিবৃত। গোটা পৃথিবীটাকে তারা যেন চার দেয়ালের মধ্যে ভরে রাখতে চায়। কোন পরিবারে গেলে সুধাময়ের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। নানাবয়সী স্ত্রী-পুরুষ শিশু-যুবক-বৃদ্ধ কার সঙ্গে কী কথা বলবে, কার

সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে নিজের মনে মহড়া দিতে দিতে সুধাময় নিজেই যেন অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু হাজারবার মহড়া দিয়েও ফল হয় না। সে যাই বলুক না, সবই যেন অসঙ্গত অপ্রাসঙ্গিক, কি নীরব আর নিষ্প্রভ বলে মনে হয়। অন্যের সঙ্গে তার কথাবার্তা, তার ব্যবহার, আচার-আচরণ সব এমন অস্পষ্ট অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে, তা যেন সুধাময়ের যথার্থ পরিচয়কে প্রকাশ করে না, আবৃত করে। হতে পারে এ তার এক ধরনের কমপ্লেক্স। সুধাময়ের নিজেরও ধারণা তাই। কিন্তু কিছুতেই এর হাত থেকে নিষ্কৃতি সে পায় না। সবচেয়ে স্বস্তি পায় সে নিজের ছোট ঘরখানার মধ্যে। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের পুরনো মেসবাড়ির একতলার কোণের এই সঙ্কীর্ণ ঘরখানাকে ননীদা ঠাট্টা করে কখনো কখনো বলে গহ্বর। কিন্তু ইতস্তত বইপত্র ছড়ানো এই গহ্বরই সুধাময়ের নিরাপদ আশ্রয়। এই ঘরের বাইরে সুধাময় বেমানান বঞ্চিত, নানাজনের অবিচারের অবহেলায়, ঔদাসীন্যে আহত ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ, কিন্তু এই গহ্বরের দুর্গে সে দুর্গাধীশ। নিজের সঞ্চিত সংগৃহীত বইয়ের স্তূপের মধ্যে তার দিন কাটে, একটা-দেড়টা পর্যন্ত রাতও কাটে। কোন কোন দিন শুয়ে আর ঘুম আসে না। কিন্তু অনিদ্রার জন্যে কোন ক্ষোভ বা জ্বালা ছিল না সুধাময়ের। এই নিঃসঙ্গ একক জীবনের বিলাস মেসের অন্য বাসিন্দাদের কাছে তাকে বিস্ময় কৌতুক কিছুটা বা শ্রদ্ধার আধার করে তুলেছে। কেউ বলে যোগী, কেউ বলে খুনী আসামী, কেউ বলে গবেষক জ্ঞানান্বেষী। যে যাই বলুক, তার গায়ে লাগে না। মনকে স্পর্শ করে না। এক নিঃসীম সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটি দ্বীপের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে তার দিন বেশ কেটে যায়। হয়তো সারাজীবন এমনি করেই কাটতে পারত। কিন্তু এক পরম কুক্ষণে ননীদা তার ষোলশো ব্রজাঙ্গনার একজন অঞ্জলি সোমের সঙ্গে সুধাময়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একটি দ্বীপের সঙ্গে আর এক দেশের আর এক পৃথিবীর যোজনা হল।

ছ বছর আগে তখন অঞ্জলিদের বাড়িতে আর একটি বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। অঞ্জলির দিদি মঞ্জুলার বিয়ে। সে বিয়ের ঘটক ননী-গোপাল। সে শুধু যে পাত্রের খোঁজ দিয়েছে তাই নয়, গয়নার দোকান, ফার্নিচারের দোকান, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ছাপবার পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়েছে। বিজয় সোম কাস্টমসের বড় অফিসার। শান্ত-শিষ্ট সুভদ্র। শুল্ক-বিভাগের বাইরে নানা কর্মকাণ্ডে বিভক্ত যে পৃথিবী, তার সঙ্গে পরিচয় অল্প। ননীগোপালের মত করিতকর্মাকে পেয়ে তিনি বর্তে গেছেন।

সুধাময় বলেছিল, 'কেন. বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী হলে কি দিনরাত মুখভার করে রাখতে হয়?'

'কিন্তু আপনি নিজে তো গুরুগম্ভীর মানুষ।'

সুধাময় হেসে বলেছিল, 'কে বললে?'

'বলবে আবার কে? দেখে বুঝি চেনা যায় না?'

সুধাময় বলেছিল. 'দেখে সবখানি চেনা যায় না।'

অঞ্জলি বলেছিল, 'আমি কিন্তু সবখানিই চিনেছি।'

সুধাময় জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। অঞ্জলি হেসে দ্রুত পায়ে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছিল।

সত্যিই মেয়েটি যেন একটু বেশি রকম পাকা। কিন্তু সুধাময়ের তাতে অভিযোগ ছিল না। এই পরিপক্কতাই যেন বাঞ্ছনীয়. সমস্ত ব্যবধান মোচনের হ্রস্বতম পথ।

মঞ্জুর বিয়েতে সুধাময় চল্লিশ টাকার একখানি সিল্কের শাড়ি উপহার দিয়েছিল। দিয়েই বুঝতে পেরেছিল, এত দামের শাড়ি ওঁরা কেউ আশা করেননি। সুধাময়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় তো ওঁদের বেশি দিনের নয়। কিন্তু সময়ের ব্যাপ্তিটাই কি সব? সম্পর্কের ঘনত্ব শুধু কি দিন-মাস-বছরের ওপর নির্ভর করে? রুচির ঐক্য একাভিমুখী মানসিক শ্রবণতা কি কালের ব্যাপ্তির চেয়ে বড় নয়? ননীগোপালের সঙ্গে অঞ্জলি নিজে সুধাময়ের মেসে এসে দিদির বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়েছিল।

ননীগোপাল বলেছিল. 'মেসোমশাই আসতে পারলেন না। তাঁর এই প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছেন। আশা করি. তোমার তাতে ক্ষোভের কারণ নেই। তোমার লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।'

সুধাময় আরক্ত হয়ে বলেছিল. 'কী যে বল ননীদা! তোমার মাথার ঠিক নেই। তাছাড়া. মানুষকে তুমি এমন অপ্রস্তুত করতে পার। সব এলোমেলো অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে তুমি ওকে নিয়ে এলে!'

ননীগোপাল হেসে বলেছিল, 'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে. আমাদের অঞ্জলি তো না তোমার ঘরে এক সম্রাজ্ঞী এসে হাজির হয়েছে। কোথায় বসাবে, কী দিয়ে অভ্যর্থনা করবে ভেবে পাচ্ছ না। অঞ্জলি. আমি এই চেয়ারটায় বসছি। তুমি বরং সুধাময়ের টেবিলের ওপর উঁচু আসনে বসো। সে প্রায় হৃদয়-আসনের সামিল হবে।'

অঞ্জলি ছদ্মকোপে ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, 'দেখুন, আপনি বড় বাজে বক বক করেন। এই জন্যেই তো আমি আপনার সঙ্গে আসতে চাইনি।'

ননীগোপাল বলেছিল. 'বটে! যতক্ষণ আমার ঘাড়ে চড়ে এলে. আমি

ছিলাম অশ্বরাজ, আর যেই কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছি আমি একেবারে অশ্বেতর বনে গেছি। এখন বাহনের দাম আর এক কাহনও নয়।'

টেবিলের ওপর উঠে বসেনি অঞ্জলি। সুধাময়ের তক্তাপোশেই বসেছিল। বন্ধু আর তার আত্মীয়কে আপ্যায়নের জন্যে মেসের চাকরকে ডাকতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সুধাময়।

অঞ্জলি বলেছিল, 'বাব্বা, কত বই আপনার! কিন্তু বইগুলি এমন যেখানে-সেখানে জড় করে রেখেছেন কেন?'

ননীগোপাল জবাব দিয়েছিল, 'ও নিজেও একটি জড়পদার্থ বলে। এবার বোধহয় জড়ে প্রাণের সঞ্চার হবে বলে মনে হচ্ছে।'

অঞ্জলি ফের তাকে শাসন করে বসেছিল, 'ননীদা আবার! বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমি যদি ফের আর আপনার সঙ্গে কোনদিন কোথাও বেরোই!'

সুধাময় সেদিন ছিল শুধু দ্রষ্টা আর শ্রোতা। বিশেষ কোন কথা বলেনি। মাঝে মাঝে অঞ্জলির সঙ্গে শুধু তার চোখাচোখি হচ্ছিল। সুধাময় লক্ষ্য করছিল অঞ্জলি লুকিয়ে তার দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছে। সে নিজেও কি আর ধরা পড়ছিল না?

যাওয়ার সময় অঞ্জলি বলেছিল, 'অবশ্য যাবেন কিন্তু। না গেলে সবাই খুব দুঃখ পাবেন। বাবা কাজের চাপে আসতে পারেননি, দিদি তো লজ্জায় কোথাও আর বেরোয়ই না—'

ননীগোপাল বলেছিল, 'তাই অঞ্জলি আজ একেশ্বরী হবার সুযোগ পেয়েছে।'

সুধাময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 'যাব।'

ওরা চলে যাওয়ার পর সুধাময় ঘটনাটুকুর মাধুর্য আরো যেন বেশি করে অনুভব করেছিল। তার এই ঘরের রুদ্ধ গহ্বরে এক জলস্রোত, উচ্ছল জীবনস্রোত কোত্থেকে এসে আবার বেরিয়ে গেল। কিন্তু একেবারে চলে যায়নি। তার শীকরকণাগুলি ঘরের হাওয়ায় ছড়িয়ে রেখে গেছে। হাসিতে দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে এক ঊষর মরুভূ জীবনকে সজল শ্যামল করে রেখে দিয়ে গেছে।

সুধাময় মঞ্জুর বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিল। অঞ্জলি হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিল 'আমার ভয় হচ্ছিল আপনি বুঝি আর এলেন না।'

॥ দ্বিরাগমন ॥

বছর সাতেক আগে পূর্ববঙ্গের একটি মহকুমা শহরে ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ঘটনা না বলে তাকে দৃশ্য বলাই ভাল, কেননা. কোন প্রসঙ্গে সেই ঘটনার কথা মনে হলে আজও ছবির মত তা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কি একটা ছুটি উপলক্ষে সেই শহরে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাসখেলা আর নৌকা বাচ্ ছাড়া সময় কাটানোর আর কোন উপায় ছিল না। বন্ধুটির আবার তাসের উপরই আসক্তি ছিল বেশি।

যতীশদের বাইরের ঘরে মাদুর বিছিয়ে সেদিনও খাওয়া দাওয়ার পর তাস নিয়ে বসেছি—বাইরে থেকে কে ডাকল, 'যতীশবাবু, যতীশবাবু আছেন?'

তাস ফেলে যেভাবে মুখখানা বিকৃত ক'রে যতীশ ঘর থেকে বারান্দায় নামল. তাতে আমরা না হেসে উঠে পারলাম না। কিন্তু বাইরে থেকে যতীশের বিস্মিত, কিছুটা বরং উদ্বিগ্ন, স্বর শুনে আমরা হাসি থামিয়ে কান খাড়া ক'রে রইলাম।

যতীশকে বলতে শুনলাম. 'এ কি বজলু, ব্যাপার কি বল তো।'

বজলু বলল, 'ব্যাপার আর কি. আতোয়ার সাহেব কিছুতেই শুনলেন না। ছোট দিদিজানকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেছেন ঘাটে। বড়দিদিজান কাঁদতে কাঁদতে গেছেন পিছনে পিছনে। আমাকে বললেন, যতীশদাকে খবর দিয়ে এসো।'

যতীশ কিছুটা হতাশার সুরে বলল. 'আমি গিয়েই বা কী করব।'

পরমুহূর্তে যতীশ ঘরে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল. 'খেলাটা খানিকক্ষণ বন্ধ রাখতে হচ্ছে প্রশান্ত. একটু কাজে যাচ্ছি।'

তারপর অন্য দুজন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলাম চৌধুরী সাহেবের ছোট মেয়েকে নাকি তার স্বামী জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চল না, কিছু করা যায় কিনা দেখি।'

কিন্তু সঙ্গীরা মাথা নাড়ল. 'দরকার নেই ভাই. ওসব হাঙ্গামা হুজ্জুত সহ্য হবে না।'

বললাম. 'আমি যদি আসি তোমার কোন আপত্তি নেই তো যতীশ?'

যতীশ বলল. 'না. আপত্তির কি আছে. এসো।'

যতীশের পিছনে পিছনে মিনিট দশেক হেঁটে খালের ধারে এসে

পৌঁছলাম। বজলুই আগে আগে পথ দেখিয়ে নিল। গোটা তিনেক ঘাট ছাড়িয়ে ছোট্ট একটি ঘাটের সামনে বজলু থেমে দাঁড়াল। বলল, 'ওই দেখুন।'

দেখলাম ইতিমধ্যেই সেখানে জনতিরিশেক লোক জড়ো হয়েছে। অধিকাংশই স্থানীয় মুসলমান। হাবে ভাবে তাদের মধ্যে মজা দেখবার মনোভাবটাই বেশি বলে মনে হল।

ঘাটের কাছাকাছি দুটি মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। দুজনেরই বেশবাস এলোমেলো হয়ে গেছে। দেখে মনে হল সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমান ঘরের মেয়ে। কিন্তু এমন চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। যে কোন অভিজাত বড় ঘরেই এরা মানাতো। দুজনেরই রং ফর্সা। আরও বড় বড় চোখ, সুন্দর মুখের গড়ন, বড়টির বয়স একুশ বাইশ, ছোটটি আঠার উনিশ। চেহারার সাদৃশ্য এত বেশি যে দেখেই বোঝা যায় দুটি বোন, বলে দিতে হয় না। ছোট মেয়েটি বড় বোনের কাঁধে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আর তার দিদির চোখেও জল টলটল করছিল।

যতীশ কাছে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছে কুসুম?' বড় মেয়েটি একটু যেন চমকে উঠল।

'এই যে তুমি এসেছ, যতীশদা।' তারপর নালিশের ভংগিতে বলল, 'আতোয়ার জোর করে রোশেনাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কারো কথাই শুনছে না।'

যতীশ কোন জবাব দেওয়ার আগেই ঘাটজোড়া একখানা বড নৌকার ওপর দাঁড়ানো পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক বলে উঠল, 'ঈস, আবার নালিশ করা হচ্ছে। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব তাতে কার কি বলবার আছে শুনি? কি করবার ক্ষমতা আছে তোমার যতীশদার?'

এতক্ষণে যুবকটির দিকে ভালো করে তাকালাম। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং খুব কালো। ছোট ছোট চোখ আর নাক দেখে শ্রীহীনের পর্যায়েই ফেলা যায়। এমন একটি সুন্দরী মেয়ের স্বামী বলে ভাবতেও কষ্ট হয়। কিন্তু চেহারার চেয়েও ওর অভদ্রতা আমাকে বেশি পীড়া দিচ্ছিল।

যতীশ শান্তভাবে বলল, 'ক্ষমতা অক্ষমতার কথা তো হচ্ছে না আতোয়ার সাহেব। আপনার স্ত্রীকে আপনি নিয়ে যাবেন তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে। আর সে আপত্তি আপনি শুনবেনই বা কেন। কিন্তু আপনার স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলেও একটা জিনিস আছে। এখন যদি না যেতে চায়, বেশতো না হয় দুদিন পরেই নেবেন।'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার ওকালতি আমি শুনতে চাইনি যতীশবাবু। যত সব চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। সবাইকেই আমি চিনি।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হুকুম করল, 'ভালো চাওতো এখনও নৌকায় উঠে এসো রোশেনা। এটা ঠিক জেনো এখানে কেউ তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না। খালি নৌকা আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব না।'

রোশেনা জলভরা চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিদি, ওকে বলে দাও, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।'

আতোয়ারের আর ধৈর্য রইল না। নৌকা থেকে এক লাফে ডাঙ্গায় নামল। তারপর রোশেনার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়িয়ে আনল দিদির কোল থেকে। টানতে টানতে রোশেনাকে নৌকায় তুলে বলল, 'যাব না! দেখি, না গিয়ে তুমি পার কী করে।'

রোশেনা একবার তার দিদির দিকে আরেকবার যতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে সত্যিই নিয়ে গেল যে।'

ওর সুর্মাপরা চোখের কোলে দেখা গেল জল টল্‌মল্‌ করছে।

কুসুম শাসনের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার আতোয়ার। এর ফল কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। দেশে এখনও আইন আদালত আছে।'

যতীশ কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ কুসুম, ঝগড়া ক'রে চেঁচামেচি ক'রে কি কিছু লাভ আছে?'

কুসুম বলল, 'তুমিও এইকথা বলছ যতীশদা! রোশেনাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও তুমি কথাটি বলছ না, উল্টে আমাকে দোষ দিচ্ছ।'

কুসুমের আয়ত সুন্দর চোখে এতক্ষণ যে জল থমকে ছিল, যতীশের কথায় তা এবার গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

যতীশ নৌকার একেবারে কাছে গিয়ে বলল, 'আতোয়ার সাহেব, আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান, বড় বংশের ছেলে—আপনার কি এসব খাটে?'

আতোয়ার শ্লেষ ক'রে বলল, 'সে তো বটেই। বিদ্বান বুদ্ধিমানেরা কি আর সবাই বউ নিয়ে ঘর করে। পরের ভোগের জন্য তারা বউকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখে যায়। আপনি বলে ফের শালিসী করতে এসেছেন। কোন মুসলমানের বাচ্ছা হলে সরমে ঘর থেকে বেরোতে পারত না।'

দেখলাম আতোয়ারের কথায় কুসুম আর রোশেনা দুই বোনেরই মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। রাগে আর অপমানে যতীশের মুখও লাল হয়ে উঠল।

যতীশ বলল, 'আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন আতোয়ার সাহেব।'

ইতিমধ্যে দু'তিনজন প্রৌঢ় মাতব্বর গোছের মুসলমান মাঝখানে এসে

পড়লেন। তাঁরা বললেন, 'যা হবার তাতো হয়েই গেছে যতীশবাবু। এ নিয়ে আর ঝামেলা করবেন না। বয়স্থা মেয়ের স্বামীর ঘর করাই ভাল। তা না হলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। একসঙ্গে থাকলে দেখবেন দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া বয়সের একটা ইয়ে আছে তো—' বলে বয়স পার-হওয়া প্রৌঢ়রা একটু হাসলেন।

মাঝিরা আর দেরী করল না। মালিকের হুকুম পেয়ে লম্বা লগি দিয়ে খালের জলে খোঁচ দিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে কুসুম কেঁদে উঠল। লগির খোঁচ যেন মাটিতে নয় তার বুকে গিয়ে লেগেছে। দোমাল্লাই নৌকা এগিয়ে চলল। নৌকার ভেতরে রোশেনার চাপা কান্নার শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়া কুসুমকে যতীশ বলল, 'ছিঃ অমন কোর না কুসুম। তোমার এ সব শোভা পায় না।'

মাতব্বরদের মধ্যে একজন বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না যতীশবাবু। কুসুম বিবিকে আমরাই এগিয়ে দিয়ে আসব।'

জ্বলন্ত চোখে তাঁদের দিকে কুসুম একবার তাকাল। তারপর যতীশের দিকে ফিরে বলল, 'চল যতীশদা।'

যতীশ এবার আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও প্রশান্ত। মাকে বলো আমি চৌধুরী সাহেবের বাসায় গিয়েছি, খানিক বাদে ফিরব।'

যতীশ ফিরে এল সন্ধ্যার পর। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে দুজনে মুখোমুখি চেয়ার পেতে বসলাম বারান্দায়। একটু চুপ ক'রে থেকে যতীশ বলল, 'তুমি বোধহয় খুব অবাক হয়ে গেছ।'

বললাম, 'তুমিও কি হওনি।'

যতীশ বলল, 'না। একেবারে তোমার মত নয়। একটু সবাক না হলে ঘটনাটা তোমাকে বোঝাতে পারব না! আর তাতে তোমার মনেও কিছু হেঁয়ালী থেকে যাবে।'

ছেলেবেলা কুসুম আর রোশেনা আমার কাছে পড়ত। ওদের বাবা আমিনর রহমান চৌধুরী বয়সের দিক থেকে এখানকার সবচেয়ে পুরনো উকিল। অবশ্য পসার-প্রতিপত্তির দিক থেকে নয়। ভদ্রলোক আমার বাবার বন্ধু এবং অত্যন্ত হিন্দুঘেঁষা। আমিনর সাহেবের বাড়িতে হিন্দু ছেলেদের ভীড়। গানবাজনার জলসা। আমিনর সাহেবের মেয়েরাও অবধি সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে, চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকে, চায়ের নিমন্ত্রণে সাড়া দেয়। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে বিধবা হয়েও কুসুম আর বিয়ে করতে চায় না। ভালো ভালো সম্বন্ধ উপস্থিত হলেও রোশেনা বাপ আর দিদির কাছে কেবল

অনিচ্ছা জানায় এবং চৌধুরী সাহেবও যে মেয়েদের রুচিমত খুশিমত চলেন তা এখানকার মুসলমান সমাজ ঠিক সুনজরে দেখতে পারেনি। ফলে এই চৌধুরী পরিবার অনেক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়েছে। এমন কি চৌধুরী সাহেবের সেরেস্তায়ও মুসলমান মক্কেল দিনের পর দিন কমে এসেছে। বাবা অনেকবার সাবধান ক'রে দিয়েছেন আমিনর সাহেবকে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ঘরের কোণে পুরনো একটা ইজিচেয়ারে তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কারো কথায় কান দেননি। ক্রমে সংসারের অবস্থা অচল হবার জো হল। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। একদিন তিনি নিজেই অচল হয়ে পড়লেন। তাঁর ডানদিকটা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড্ হয়ে গেল।

জমিজমা কিছু করতে পারেননি। ব্যাংকে জমার ঘরও শূন্যপ্রায়। আত্মীয়স্বজনও তেমন কেউ নেই। খবর পেয়ে কুসুম সেই যে শ্বশুর-বাড়ি থেকে এল, আর কিছুতেই বাপকে ছেড়ে যেতে পারল না। সংসার চালাবার ভার তার ওপরই পড়ল। এখানকার অভিজাত মহলে ঘুরে আমি ওকে কয়েকটা গানের টুইশন জুটিয়ে দিলাম। দুই বোনেরই গানের রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করলাম।

হিন্দু মুসলমান শহরের সকল যুবকের নজর গিয়ে পড়ল এই দরিদ্র পরিবারটির ওপর। লোভও বলতে পার। দুই বোনের রূপগুণের খ্যাতি শুনে, দুই বোনেরই চমৎকার সম্বন্ধ আসতে লাগল। কিন্তু কেউ তা কানে তুলল না। তারা তিন জনে মিলে যে দুর্গ রচনা করেছে, তার মধ্যে আর যেন কারো স্থান নেই। পৃথিবীর আর সবাই যেন সেখানে বাহুল্য। বাপ মেয়ে বোনে বোনে এমন অদ্ভুত সম্পর্ক আমি আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু লোকে তা শুনবে কেন নানারকম নিন্দা অপবাদ রটাতে লাগল।

অতিষ্ঠ হয়ে কুসুম বলল, 'তুই বিয়ে কর রোশেনা। নুরপুরের আতোয়ার সাহেব লোকটি বেশ ভালই, বিদ্বানও শুনেছি।'

আতোয়ার নুরপুর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার।

রোশেনা হেসে বলল, 'এত যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তুমিই কর।'

কুসুম বললে, 'দূর, আমার হাতে পড়লে বেচারা অকালে প্রাণ হারাবে। একবার তো ক'রে দেখলাম, বছরখানেকও টিকল না। পরের ছেলের ওপর দিয়ে বারবার এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা ভাল নয়। তোকেই বিয়ে করতে হ'বে রোশেনা।'

শেষ কথাটায় কুসুমের একটু আদেশের সুরই বেজে উঠল।

তারপর বিয়ে হয়ে গেলেও আতোয়ারকে কেন যে রোশেনার পছন্দ হল

না আমি তা জানি না। এইটুকু জানি আর যাই হোক তার প্রণয়ভাজন এই অভাজন নয়। কুসুম সম্বন্ধেও সেই কথা। ইনিয়ে-বিনিয়ে পায়ে পড়েই কাঁদ, আর জোর ক'রে ছিনিয়েই নাও, সবাইর হৃদয় যে সকলের সামনে খোলে না, একথাটা আতোয়ার বুঝতেও পারেনি। বিশ্বাসও করেনি।

কিন্তু ছোট বোন শ্বশুর-বাড়িতে গেলে কোন দিদির মনে যে এরকম মৃত্যুশোক উপস্থিত হয় তা আজ আমি এই প্রথম দেখলাম। বাড়িতে গিয়েও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কুসুমের সে কি কান্না!

'তুমি কেন ছেড়ে দিলে। তুমি কেন বাধা দিলে না, যতীশদা।'

যত বলি—আতোয়ার শিক্ষিত, ভদ্ররুচির ছেলে। রোশেনাকে এতদিন পায়নি বলেই সে এমন হিংস্র নির্মম হয়ে উঠেছে ; কুসুম ততই ক্ষেপে যায়। বলে, 'ছাই চিনেছ তুমি, ও একটা পশু, একটা জানোয়ার। ও না করতে পারে এমন কাজ নেই। কোন মেয়ে ওকে কোনদিন ভালবাসতে পারবে না।'

এরপর আমার আর কি বলার থাকতে পারে। তার সেই রাগ সেই কান্নার দিকে তাকিয়ে তোমাকেও চুপ ক'রে থাকতে হত প্রশান্ত। তুমিও কোন কথা খুঁজে পেতে না।

এই ঘটনার বছর তিনেক বাদে আরও একবার সেই শহরে আমাকে যেতে হয়েছিল। উপলক্ষ ছিল যতীশের ছেলের অন্নপ্রাশন। অফিস থেকে ছুটি পাওয়া কষ্ট। কিন্তু যতীশ আর তার মা-বাবার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

শহরের গণ্যমান্যদের মধ্যে অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন দেখলাম। যতীশদের স্বজন বন্ধুরাও অনেকে এসেছেন। মাছ মাংস পোলাওর মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শেষ ক'রে একে একে সবাই বিদায় নিলেন।

যতীশকে বললাম, 'রাত্রেও তোমার গেষ্ট আছে নাকি?'

যতীশ বলল, 'দুচার জন ক্রিশ্চিয়ান আর মুসলমান বন্ধুবান্ধব আসবেন। অফিসার মহল থেকেও দু'চারজনের আসার কথা আছে।'

রাত্রের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আতোয়ার আর সেই দুই বোনের এক জনকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

অবাক তাদের উপস্থিতিতে হইনি। হয়েছি তাদের চোখমুখের প্রসন্নতায়, চলাফেরার মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাব লক্ষ্য করে। সেদিনের প্রৌঢ় মাতব্বরেরা তাহলে ঠিক কথাই বলেছিলেন। অবশ্য যতীশের বাড়িতে আতোয়ার এসেছে বলে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম একথা অস্বীকার করব না।

যতীশ স্মিতমুখে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ ক'রে যতীশ বলল, 'ইনি মিসেস কুসুম কাজি। আমার ভূতপূর্ব ছাত্রী, আর ইনি ওঁর স্বামী আতোয়ার সাহেব।'

কুসুমের স্বামী আতোয়ার! যতীশ ভুল বলল, না আমিই ভুল শুনলাম, হঠাৎ ঠিক ক'রে উঠতে পারলাম না। আরেকটু হলেই আমার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের কথা বেরিয়ে পড়ত। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করলাম। ওদের সঙ্গে সেলাম বিনিময় করলাম।

আমি পরের দিন চলে যাব শুনে সকালে ওরা আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। কথায় কথায় জানা গেল, ওঁরাও কাল আটটা নটায় চলে যাচ্ছেন।

অনেক রাত্রে নিমন্ত্রণের ভিড় কাটলে যতীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আমার যেন মনে পড়ছে দুইবোনের মধ্যে বড়টিই ছিল কুসুম আর ছোটটি রোশেনা। গোলমালটা তাকে নিয়েই হয়েছিল।'

যতীশ ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

বললাম, 'তাহলে তুমিই ভুল করেছ বল। রোশেনা বলতে গিয়ে কুসুম বলেছ।'

যতীশ বলল, 'না আমি ঠিকই বলেছি। যাকে দেখলে সে কুসুমই, রোশেনা নয়।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কুসুম! সে কেন বিয়ে করতে যাবে আতোয়ারকে। আর কুসুমই যদি হবে, তাহলে তার কি এই ক'বছরে বয়স একটুও বাড়েনি।'

যতীশ ঠাট্টা ক'রে বলল, 'প্রথমে বেড়েছিল। তারপরে ফের কমতে শুরু করেছে। তাছাড়া ও বোধহয় শুধু আর কুসুম নয়, ওর মধ্যে রোশেনাও আছে।'

বললাম, 'হেঁয়ালি রাখ। কেন, আসল রোশেনার কি হল?'

যতীশ সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'মারাত্মক কিছু হয়নি। আতোয়ার তালাক দেওয়ার পর বছরখানেকের মধ্যেই তার আবার বিয়ে হয়েছে। ভালো ঘর, ভালো বর। ভদ্রলোক সরকারি অফিসার, এখন সপরিবারে করাচীতে আছেন।'

বললাম, 'কিন্তু কুসুমের এমন মতি হল কেন?'

যতীশ অদ্ভুত একটু হাসল। 'মেয়েদের মন, বন্ধু, দেবতারাই জানেন না, আর কুতঃ যতীশঃ! তবু আমাকে ইসারায় কুসুম যতটুকু জানিয়েছে ততটুকু তুমিও শোন।'—

মাতব্বরদের বচন সেবার সার্থক হয়নি। রোশেনা সেবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর দু'তিন মাস কাটতে না কাটতেই স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার

নানারকম অশান্তি আর অ-বনিবনার খবর আসতে লাগল। এর আগেও রোশেনা দু'একবার স্বামীর ঘরে গিয়েছে কিন্তু মনোমালিন্যটা কোনবার এমন চরমে গিয়ে ওঠেনি। মতান্তর কেবল মনে আর বাক্যেই নয়—আতোয়ারের হাতও নাকি মাঝে মাঝে চলেছে। দু'জনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তালাক দিতে আতোয়ারই এগিয়ে এল। ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে দুপক্ষের মিল হওয়ায় মামলা মোকদ্দমার আর দরকার হল না।

রোশেনা ফিরে এল কুসুমের কাছে। কিন্তু আগের মত সেই দিদি-সর্বস্বতা আর নেই। মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে রোশেনা। ঘরের নির্জন কোণে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মাঝে মাঝে অন্যরকম মেজাজও আবার দেখা যায়। দেখা যায় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খুব হৈ-হল্লা করছে।

কুসুমকে চিন্তিত দেখা গেল।

বললাম, 'ওর আবার বিয়ে দাও কুসুম।'

আমিনর সাহেবেরও সেই মত।

সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছিল। অপপ্রচারের ফলে কিছু অখ্যাতি অপবাদ এদের থাকলেও দুবোনেরই শিক্ষা সংস্কৃতি রূপলাবণ্য সেই অপবাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

দু'একটা সম্বন্ধ নাকচ করা হল। তারপর এলেন সেই অফিসার। বেশ সুদর্শন চেহারা। মিষ্টি কথাবার্তা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। দেখে রোশেনা খুশি হল। কুসুমও।

আনাগোনা খোঁজখবরে আরও দুমাস কাটল। তারপর তার সঙ্গে রোশেনার বিয়ে হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'খবরদার ফের যেন কান্নাকাটির কথা না শুনি।'

রোশেনা ঠোঁট টিপে হাসল।

আরও মাসখানেক কাটল। কুসুম ট্যুইশন করে, মক্কেলদের দলিলপত্র বাবাকে পড়ে শোনায়। তাঁর হয়ে মুসবিদা করে। মুহুরিদের সঙ্গে আলাপ করে আর অবসর সময় সেতার বাজায়।

একদিন ট্যুইশন থেকে ফেরার পথে আতোয়ারের সঙ্গে কুসুমের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষী হয়ে আতোয়ার শহরে এসেছিল। ভূতপূর্বা শালীর মুখোমুখি পড়ে যাবে ভাবেনি। প্রথমটায় দুজনই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর আতোয়ার বলল:

'আপনার বাবা কেমন আছেন?'

কুসুম লক্ষ্য করল আতোয়ারের চেহারা ভারি খারাপ হয়ে গেছে। রোগাটে

মুখ, চুলগুলি উস্কোখুস্কো। শরীরের দিকে কোনরকম নজর নেই। আতোয়ার বলে যেন চেনাই যায় না।

একটু চুপ ক'রে থেকে কুসুম বলল, 'একই রকম আছেন। চলুন না, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।'

আতোয়ার একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'কিন্তু তিনি বিরক্ত হবেন না তো।'

এই কি আতোয়ারের গলা, আতোয়ারের ব্যবহার?

কুসুম লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, বিরক্ত হবেন কেন? চলুন।'

চৌধুরী সাহেব ভূতপূর্ব জামাইকে দেখে খুশিই হলেন। এত সব কান্ডকারখানার পরও যে আতোয়ার তাঁকে দেখতে আসবে, তিনি তা আশা করেননি। আদর ক'রে তিনি আতোয়ারকে পাশে বসতে দিলেন। এত আদর জামাই থাকা কালেও বোধহয় আতোয়ার পায়নি। চৌধুরী সাহেবের আজ আর কোন ক্ষোভ নেই, কোন বিদ্বেষ নেই। কারণ পরের বারের বিয়েতে রোশেনা সুখী হয়েছে।

আতোয়ারের চেহারার দিকে তাঁরও চোখ পড়ল। বললেন, 'কোন অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি? চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে।'

ম্লান হেসে আতোয়ার জবাব দিল, 'না।'

চৌধুরী সাহেব খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর লজ্জার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে টিয়ে করেছ তো?'

এবার আর আতোয়ার হাসল না। মৃদুস্বরে বলল, 'না।'

চৌধুরী সাহেব ছোট একটা নিঃশ্বাস চাপলেন।

কুসুম উঠে যেতে যেতে বলল, 'যাই তোমার জন্য চা নিয়ে আসি বাবা।'

চৌধুরী সাহেবকে চা দিতে এসে আতোয়ারকে লক্ষ্য ক'রে কুসুম বলল, 'কাজী সাহেবের আমাদের হাতে চা খেতে কোন আপত্তি নেই তো?'

চৌধুরী সাহেব মেয়ের দিকে ভ্রূকুটি করলেন। আতোয়ার অদ্ভুত একটু হাসল। বলল, 'তাই শুনে বুঝি চায়ের ব্যবস্থা হবে?'

কুসুম বলল, 'তা ছাড়া কি! মিছিমিছি ফেলে কি লাভ হবে। তা হলে দয়া ক'রে চলুন ও ঘরে।'

পাশের ঘরে গিয়ে আতোয়ার দেখল কেবল চা-ই নয় ছোট একটু জল-খাবারেরও আয়োজন করা হয়েছে।

আতোয়ারকে খেতে দিয়ে কুসুম বলল, 'ভেবেছিলাম নাওয়া খাওয়া বোধহয় আপনি ছেড়েই দিয়েছেন।'

একটুকরো মিষ্টি ভেঙে মুখে দিতে দিতে আতোয়ার বলল, 'কেন?'

কুসুম বলল, 'কেন কি জানি। বোধহয় বৌয়ের শোকে—' কুসুমের পাতলা ঠোঁটে শাণিত একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

আতোয়ারের মুখ অত্যন্ত করুণ আর বিবর্ণ দেখাল। মনে হল একটা তীর গিয়ে তার বুকে বিঁধেছে। মিষ্টিটুকু কোনরকমে খেয়ে আতোয়ার বলল, 'আপনি সত্যি কথাই বলেছেন।'

কুসুম বলল, 'তাই নাকি। তাহলে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন না।'

আতোয়ার ম্লান মুখে একটু হাসল। তারপর বলল, 'এবার তাহলে চলি।'

কুসুম বলল, 'কোথায় উঠেছেন এখানে?'

আতোয়ার বলল, 'একটা হোটেলে।'

কুসুম বলল, 'হোটেলের চেয়ে এ জায়গাটা কি এতই খারাপ যে, এত তাড়াহুড়া করছেন।'

যে জবাবটা আতোয়ারের মুখে এসেছিল সেটা বেরোতে বেরোতে আটকে গেল।

সে রাত্রে কুসুম আর চৌধুরী সাহেব তাকে ছাড়লেন না। কুসুম নিজে হাতে রান্না ক'রে আতোয়ারকে কাছে বসিয়ে খাওয়াল। আজ তার মনেও কোন ক্ষোভ নেই, আতোয়ারের কাছে তাদের আর আশা করবার কিছু নেই। দুঃখ করবারও আর ভয় নেই। বোধহয় সেইজন্য সৌজন্য আর শিষ্টাচার জামাই-আদরকেও ছাড়িয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আতোয়ারের জন্য কুসুম বিছানা পাতল। সৌজন্যের যেন কোন ত্রুটি না হয়। বরং বাহুল্য ভাল। যত বেশি লজ্জা দেওয়া যায়। বাটায় ক'রে পান নিয়ে এসে আতোয়ারের বিছানার পাশে দাঁড়াল কুসুম। আতোয়ার এতটা আশা করেনি। আশা না বলে আশঙ্কা বলা যায়। এই আদর যত্নের বাড়াবাড়ির মধ্যে যে গোপন আঘাত লুকিয়ে ছিল, আতোয়ারের বুঝতে তা দেরি হয়নি। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আতোয়ার বলল, 'যত্নটা রোশেনাও জানত।'

কুসুম বলল, 'তার মানে?'

আতোয়ার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মানে আবার কি?'

রোশেনার কথা উঠে পড়ায় কুসুম যেন একটু লজ্জা পেল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনি তাকে এখনও ভুলতে পারেননি?'

আতোয়ার বলল, 'ভোলা কি এত সহজ?'

কুসুম বলল, 'কি ভুলতে পারেননি, তার জ্বালা?'

আতোয়ার কোন জবাব দিল না।

রোশেনার জন্যে মনে মনে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ আর গর্ব বোধ করল কুসুম। ত্যাগ ক'রেও আতোয়ার যে তাকে ভুলতে পারেনি বরং নতুন ক'রে তার মূল্য বোধ করতে শুরু করেছে এতে কুসুমদেরই জয়। রোশেনার যাতে সুখ, যাতে আনন্দ, যাতে অহংকার তাতো কেবল রোশেনারই নয়, তাতে কুসুমেরও অংশ আছে যে। আচার আচরণে শিক্ষা-দীক্ষায় রোশেনা যে তাকেই অনুসরণ করেছে। এমন কি সাজসজ্জাটি পর্যন্ত কুসুমের কাছ থেকে শিখেছিল রোশেনা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কুসুম বলল, 'তার কথা থাক কাজী সাহেব, সে এখন পরস্ত্রী।'

আতোয়ার যেন চমকে উঠল। রোশেনা পরস্ত্রী এটা যেন নতুন ক'রে অনুভব করল। যেন নতুন একটা তীর এসে বুকে বিঁধল।

একটু পরে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে আতোয়ার বলল, 'আমাকে মাপ করবেন কুসুম বিবি—।'

কুসুম অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না, না, মাপ করবার কি আছে। কিন্তু আপনি তাকে এত ভালবাসতেন—'

আতোয়ার বলল, 'সে কথা কাউকে বোঝাতে পারিনি এই দুঃখ রয়ে গেল। নিজেও কি এমন ক'রে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম?'

কুসুম কোন জবাব দিল না কিন্তু আতোয়ারের কথার সুর তার মনের মধ্যে কেমন এক বেদনার সৃষ্টি করল। অথচ দুঃখের কোন কারণই তো আর নেই। রোশেনা তো আজ সম্পূর্ণ সুখী হয়েছে।

আতোয়ার চলে যাওয়ার সময় চৌধুরী সাহেব বললেন, 'আর একদিন এসো বাবা।'

আতোয়ারের মনে হল কেবল মৌখিক ভদ্রতা নয়, ওর মধ্যে কোথায় যেন মনের স্পর্শ রয়েছে। কুসুম মুখে কিছু বলল না বোধহয় বলতে বাধল বলেই।

কিছুদিন বাদে আতোয়ার হঠাৎ আর একদিন এলো।

কুসুম বলল, 'তবু ভাল, আমরা ভাবলাম, বুঝিবা ভুলেই গেলেন।'

যেখানে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, ভুলে যাওয়াই দুপক্ষের কাম্য সেখানে এ অভিযোগটা নিতান্তই লৌকিক। তবু কুসুমের বলার ধরনে কথাটা সে রকম শোনাল না।

ও কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছেন বোধহয়।'

কুসুম বলল, 'না না, অবাক হব কেন?'

শোবার সময় কুসুমের বাটা থেকে একটা পান তুলে নিয়ে আতোয়ার বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।'

কুসুম বলল, 'বলুন।'

আতোয়ার বলল, 'কেবল এই পান দেওয়াই তো নয়। চলা ফেরা কথাবার্তায় আপনারা দু'বোন একেবারে এক রকম। চেহারার মিল তো সকলেরই চোখে পড়ে, সে কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু আপনাদের স্বভাবেরও খুব মিল আছে।'

কুসুম লজ্জিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, 'এসব কথা তুলে লাভ কি?'

আতোয়ার বলল, 'কিছু একটা আছে। এখানে এলে মনে হয় তাকে একেবারে হারাইনি।'

কুসুমের বুকের ভিতরটা থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠল।

আসা যাওয়ার সময়ের ব্যবধানটা আরও কমতে লাগল। আতোয়ার না এলে কুসুম তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠায়। আলাপটা প্রথমে রোশেনাকে নিয়েই আরম্ভ করা হয়। কুসুম তার ক'খানা চিঠি পেয়েছে। নতুন জায়গায় গিয়ে তারা কেমন আছে। কী রকম সমাজের সঙ্গে তাদের মেলা মেশা। তাদের ঘরকন্নার খুঁটিনাটি সব কুসুম আতোয়ারকে শোনায়। একটি সুখী সংসারের ছবি তার সামনে তুলে ধরে। এর মধ্যে যে কোনরকম নিষ্ঠুরতা আছে কুসুমের তা মনে হয় না। আতোয়ারের চোখ মুখ দেখে বোঝা যায় না যে সে কোনরকম কষ্ট পাচ্ছে।

তারপর দু'জনেই দু'জনকে বুঝতে পারল। মুখে স্বীকার না করলেও কথাটা কারো কাছে গোপন রইল না। আসলে নেপথ্যচারিণী রোশেনা উপলক্ষ, তাদের দু'জনের মধ্যে আলাপের সেতু। সেই সেতুর ওপর দিয়ে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলতে লাগল।

আরও কিছুদিন পরে আতোয়ার একদিন বলল, 'রোশেনার কথা আজ থাক। সে এখন পরস্ত্রী।' কুসুমও তাই চাইছিল। বোনের ছদ্মবেশ পরে থাকতে তার আর ভাল লাগছিল না। আরেকজনের ওড়না সরিয়ে এবার সে নিজের মুখ বার করল।

কুসুমের সঙ্গে আতোয়ারের বিয়ে। সারা শহর এ খবরে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলল, 'ছিঃ ছিঃ এক মেয়ে দিয়েও আমিনর সাহেবের শিক্ষা হয়নি? আবার আরেক মেয়েকে দিচ্ছেন। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।'

কিন্তু এ অপবাদ একেবারে বাজে। কুসুম মোটেই সে টাইপের মেয়ে নয়। ওর মত মেয়ে হয় না।

যতীশ তার কাহিনী শেষ করল।

আমি বললাম, 'কিন্তু বন্ধু, একটা কথা যে বাকী রইল। এই খণ্ডনাট্যে তোমার ভূমিকাটি কী?'

'আমার আবার কিসের ভূমিকা?' যতীশ হেসে উঠল। 'আমি শুধু সূত্রধার।'

যতীশের স্ত্রী যূথিকা চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এল। স্বামীর শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল। আগের কথাগুলিও নিশ্চয়ই আড়ি পেতে শুনেছে।

যূথিকা হাসতে হাসতে বলল, 'সূত্রধার না আরো কিছু, আসলে কুসুম জেদ ক'রে এই বিয়ে করেছে। তার এক ভীরু মেরুদণ্ডহীন মাষ্টারমশাইর ওপর রাগ ক'রে।'

'যত সব আজগুবি কল্পনা।' বলতে বলতে যতীশ আরও জোরে হাসতে লাগল।

এত জোর তার কোন দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে কিনা জানি না।

॥ কুশাঙ্কুর ॥

দুই প্রৌঢ় বন্ধু সুখ দুঃখের গল্প করছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। অন্দরের দরজায় নীল রঙের পুরু পর্দা ঝুলছিল। বাইরের দরজাতেও অমরেশ সেন খিল তুলে দিয়ে এসেছিলেন। রেডিওতে একটু আগে যে রাগ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজছিল তাও তিনি উঠে গিয়ে বন্ধ করে এলেন। অতিথি সতীকান্ত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ওকি করছ। ভিতর থেকে কেউ হয়তো শুনছিলেন—।' অমরেশ বললেন, 'আরে না না। অনেক সময় কেউ না শুনলেও ওটা বাজে। দোকানের রেডিওর মত ওটা সহজে বন্ধ হতে চায় না।'

গালে কপালে কয়েকটি কুঞ্চিত রেখায়, গলার স্বরে অমরেশের বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল। সতীকান্ত বন্ধুর এই রূঢ়তাটুকু লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন এই বোধ হয় প্রৌঢ় বয়সের ধর্ম। কথায় বার্তায় চালচলনে সহজেই অসহিষ্ণুতা বেরিয়ে পড়ে। নিজের অজ্ঞাতে শরীরে মনে কর্কশতা এসে স্থায়ী আসন পাতলে মাথার চুল কটা হয়, দাড়ি কড়া হয়, পাক ধরে আর হৃদয়ও শক্ত হয়ে ওঠে। অমনিতে অমরেশ সেন ভালোই আছে। ওকালতিতে পসার বেড়েছে। চেহারায় স্বাস্থ্য আর স্বচ্ছলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও তা ধরবার জো নেই। কিন্তু চালচলনে ধরা পড়ে যৌবন বিগত। সেই কলেজ আমলের বন্ধুকে উত্তীর্ণ পঞ্চাশ প্রৌঢ়ের মধ্যে দেখতে পাওয়ার আশা করাই বৃথা। বরং বন্ধুর মুখে ইচ্ছা করলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারেন সতীকান্ত সান্যাল। অমরেশের সমবয়সী হলেও মাথা জোড়া টাকের জন্যে তাঁকে আরও বয়স্ক দেখায়। তাঁর চেহারায় রুক্ষতা জীর্ণতার ছাপ বরং বেশি করেই পড়েছে। পড়া স্বাভাবিক। অমরেশের মত তাঁর আর্থিক সাফল্য হয়নি। বীমা অফিসের কেরানী। কিছুকাল আগে প্রমোশনের ফলে অফিসারের মর্যাদা জুটেছে। এদিকে অবসর নেওয়ার সময়ও তো হয়ে এল।

সতীকান্ত কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নীল পর্দা একটু সরিয়ে একখানি কোমল কচি মুখ উঁকি দিয়েছে।

তিনি কিছু বলবার আগেই অমরেশ তাকে কাছে ডাকলেন, 'কে? ঝণ্টু মহারাজ? এসো এসো। আরে লজ্জা কি এসোই না।'

তাঁর গলার স্বরে শুধু অভয় নয় রীতিমত প্রশ্রয় ফুটে উঠল।

সতীকান্ত দেখলেন ছেলেটি এবার তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে অমরেশের কাছে গিয়ে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আট ন বছর হবে বয়স। গায়ের রঙ ফুটফুটে ফরসা। পরণে নীল রঙের হাফ প্যান্ট, গায়ে সবুজ জাম্পার। মাথায় তামাটে চুল কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। ছেলেটি অমরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন ফিসফিস করে বলল।

অমরেশ অক্ষমতার ভান করে বললেন, 'অত পারব না। গরীব মানুষ। ট্যাক্সটা একটু কমটম করে ধার্য কর ঝন্টু। আচ্ছা আচ্ছা। আর মুখ ভার করতে হবে না। দিচ্ছি।'

পকেট থেকে একখানি সিকি বার করে অমরেশ ওর হাতে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওকে যেতে দিলেন না। ঝন্টুর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর কোমল গালে গাল ঘষতে লাগলেন। সতীকান্তের মনে হল স্নেহের তীব্রতায় দাঁতে ও দাঁত ঘষলেন। কয়েক হাত দূরে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে তিনি তাঁর বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলেন। এই মুহূর্তে বাৎসল্যের বন্যায় একেবারে ভেঙে গেছেন অমরেশ। তাঁর সমবয়সী আর একজন পুরুষ যে এ ঘরে উপস্থিত রয়েছেন সে কথা তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। সতীকান্ত লক্ষ্য করলেন অমরেশের রেখাসঙ্কুল প্রৌঢ় মুখের কাঠিন্য আর নেই, তার বদলে এক স্নেহকোমল আর্দ্রতা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য লোকের চোখে এই একান্ত ব্যক্তিগত স্নেহের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ যে একটু বিসদৃশ লাগতে পারে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই অমরেশের।

তাঁর আদর কতক্ষণ চলত বলা যায় না, কিন্তু ছেলেটিই নিমেষের মধ্যে বিরত আর পীড়িত হয়ে উঠল। 'উঃ জেঠামুনি, ছাড়ো ছাড়ো। তোমার দাড়ি কী কড়া। আমার গাল জ্বলে গেল।'

অপ্রতিভ অমরেশ তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেটি যেন একই সঙ্গে স্নেহের বন্ধন মুক্তির আনন্দ অনুভব করে দুই প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল। তারপর এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার অমরেশের লজ্জিত হবার পালা। তিনি হঠাৎ কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

সতীকান্ত বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'কে ওটি!' অমরেশ বললেন, 'আমার ভাইপো। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে।'

সতীকান্ত বললেন, 'তাই বুঝি সবচেয়ে আদরের। ও তোমার খুব বাধ্য দেখছি।'

অমরেশ বললেন, 'আসলে আমিই খুব বাধ্য।'

তারপর অস্বস্তিটুকু কাটাবার জন্যে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা বন্ধুর দিকে

এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও ধরাও। আসলে আমিই বাধ্য। আমিই আবদ্ধ। দেখ স্নেহ ভালবাসার যারা শুধু প্যাসিভ অবজেক্ট তারাই সুখী। যে অ্যাকটিভ পার্টনার তারই দুঃখের শেষ নেই।'

সতীকান্ত কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন।

অমরেশ বললেন, 'ও আমাকে আরো ছোটবেলা থেকে জ্যেঠামুনি বলে ডাকে। আসল কথাটা মনি। আর সবাই ওর এই উচ্চারণের ভুলটা শুধরে দেয়। কিন্তু আমি শোধরাতে চাইনে। ওর মুখের ওই মুনি কথাটুকুই আমার দুই কানে অমৃত ঢেলে দেয়। আসলে আমরা কেউ মুনি ঋষি নই। কিন্তু কেউ বললে বড় ভালো লাগে, কেউ উপাধি দিলে বড় ভালো লাগে। আমরা যা নই তাই হতে ভালবাসি। কে জানে কোন কোন মুহূর্তে কি মুহূর্তেরও এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে তা হয়েও যাই।'

সতীকান্ত এবারও কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাঁর দেওয়া সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু উত্তরের প্রয়োজন নেই, মন্তব্যেরও দরকার নেই। নিজের ঝোঁকেই অমরেশ বলে যেতে লাগলেন, 'একদিন হয়তো ওর এই উচ্চারণের ভুল ও শুধরে নেবে। ও যত বড় হবে নিজেকে তত দূরে সরিয়ে নেবে। যেমন আমার ছেলেমেয়েরা নিয়েছে। তারা এখন ঢের বড় হয়ে গেছে। তাদের আমি আর কাছে পাইনে। হাতের কাছে নয়, বুকের কাছে নয়, মনে হয় মনের কাছেও না।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসলেন অমরেশ, 'এ ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরী আছে জানো?'

সতীকান্ত এবার একটু কৌতূহল দেখিয়ে বললেন, 'কী থিয়োরী?'

অমরেশ বললেন, 'স্নেহই বলো, ভালবাসাই বলো দেহ ছাড়া কিছুই টেঁকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই দেহের স্বাদ আমরা পাই, দেহের স্বাদ আমরা নিই। দৃষ্টিতে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, বচনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে কিসে পাই জানো? ত্বকে। স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন সব এই ত্বকের কাজ। ভাই বলো, বন্ধু বলো, ছেলে বলো বেশি বয়সে এসে তারা আমাদের এই ত্বককে আর স্পর্শ করে না। এক বিজয়ার দিন ছাড়া বয়স্ক আত্মীয় বন্ধু আত্মজ—কাকেই বা আমি আমার আলিঙ্গনের মধ্যে পাই? পেতে লজ্জা পাই, তারাও লজ্জা পায়। কিন্তু যদি এই লজ্জা বোধ না থাকত, যদি সংস্কারের বাধা না থাকত তবে হয়তো আমি তাদের বেশি করে পেতাম, বেশি করে দিতে পারতাম। বেশি বয়সে আমাদের আবেগ যে শুকিয়ে আসে তার কারণ আমরা ত্বকের ব্যবহার ভুলে যাই, ত্বকের ব্যবহারে লজ্জা পাই।'

সতীকান্ত একবার সামনের দিকে তাকালেন। কাঁচের আলমারিগুলিতে

বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে লেগেছে। সোনার জলে নাম লেখা বাঁধানো আইনের বইগুলি তার মধ্যে ঝকঝক করছে। এই আইনজীবী শক্ত কাঠখোট্টা বিষয়ী বন্ধুর মুখে বহুকাল তিনি এমন আবেগ উষ্ণ কথা শুনতে পাননি, এমন অকপট স্বীকৃতি শোনেন নি, এমন অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন নি। যে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হতে হতে সাধারণ সৌজন্য আর মামুলী পরিচয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল সেই হৃত সৌহৃদ্যকে তিনি যেন নতুন করে ফিরে পেলেন। এই শীতের অপরাহ্নে কিসের এক প্রবল প্রচণ্ড উত্তাপ বরফ গলাতে লাগল। হৃদয়ের আগল খুলে দিয়ে সতীকান্ত বলতে লাগলেন, 'তোমার পরম সৌভাগ্য অমরেশ, তোমার ছেলেমেয়েরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে, আর বড় হয়ে দূরে সরে যেতে পেরেছে। তোমার স্নেহের আলিঙ্গনে তারা বন্ধ থাকেনি এ তোমার পরম সৌভাগ্য। আমার দুঃখ দুর্ভোগ তোমাকে ভোগ করতে হয়নি। বয়স হলেও বড় না হবার যে কী বিড়ম্বনা—।'

অমরেশ বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোকথা তোমার ছেলেটি কেমন আছে সতী? গোড়ার দিকে একটু অ্যাবনর্মালিটি ছিল। এখন ভালো হয়ে গেছে বলেই তো শুনেছি। কে যেন বলছিল তোমার ছেলে আজকাল—।'

সতীকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকের কাছেই আমি তাই বলি। বলি ভালো হয়ে গেছে। নিজের লজ্জা আর দুঃখের কথা অন্যকে মিছামিছি জানিয়ে লাভ কি বলো।'

অমরেশ একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আমাকেও তো তুমি কিছু জানাও নি। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করেছি তুমি এড়িয়ে গেছ। আমি আর জোর করিনি। তুমি যখন বলতে চাও না, তুমি যখন চেপে যেতেই চাও—'

সতীকান্ত বললেন, 'যে দুঃখের কোন প্রতিকার নেই অমরেশ তার কথা বেশি বলে কী হবে। আজ বলছি শোন। আজ সেই পুরনো দুঃখের সঙ্গে নতুন এক দুর্ভোগ এসে জুটেছে। কিন্তু পুরনো কথাই আগে বলি। তুমি তো সব জানো না। অবশ্য আমি যে তোমার তুলনায় একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলাম তা তুমি জানো। আগে থেকে আমাদের জানাশোনাও হয়েছিল। প্রথম তিন বছরের মধ্যে আমাদের কোন ছেলেপুলে হয়নি। আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম, 'ধরো যদি আমাদের ছেলেপুলে কিছু নাই হয়।'

অসীমা বলত, 'বেশ হবে। আমরা যা খুসি তাই করব, যেখানে খুসি যাব, হাতে পায়ের কোন বন্ধন থাকবে না।'

কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ওর শরীরেই শুধু পরিবর্তন এল না হাবভাব ধরনধারণ সবই বদলে গেল। তখন বুঝতে পারলাম এর আগে ও যা সব বলত তা শুধু মুখেরই কথা। ও যেন শুধু এরই প্রতীক্ষা করছিল, সন্তান

ছাড়া ওর আর যেন কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। আমরা তখন গড়পারের একটা বাড়িতে থাকি। বাড়ি বলতে হবে বলেই তাকে বাড়ি বললাম। শুধু পুরনো নয় একেবারে জরাজীর্ণ। কোন শ্রীছাঁদও ছিল না। আমাদের একতলার দুখানি ঘরে ভালো করে আলো বাতাস ঢুকত না। অসীমা যখন এ বাড়িতে প্রথম আসে সে কোন আপত্তি করেনি। সে আমার ক্ষমতার কথা জানে। সে আমার শক্তির সামান্যতাকেই স্বীকার করে নিয়েই স্বয়ম্বরা হয়েছে। অসীমা বলেছিল, 'এই আমার ঢের। এই আমার রাজপ্রাসাদ।'

রাজপ্রাসাদ না হোক মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা তো মিলেছে। এতদিন আমরা দেখা করেছি পার্কে রেস্টুরেণ্টে ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে। আমাদের স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না। আমি থাকতাম একটা শস্তা মেসে। আর ও থাকত ওর দূর সম্পর্কের মামা বাড়িতে। তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই সেই আশ্রয় ছাড়বার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের ভাঙা ঘরকেই অসীমা মনের মত করে সাজিয়েছিল। ওর ধরন-ধারণ দেখে মনে হয়েছিল এই বাসা যেন আমাদের অল্পদিনের ভাড়াটে বাসা নয়, এখানে আমরা যেন সারা জীবনের মত বসবাস করবার জন্যেই এসেছি। কিন্তু এখন থেকে ও অন্য সুর ধরল। কেবলই বলতে লাগল, 'বাসাটা কিন্তু এবার তোমার বদলাতে হবে।' আমি হেসে বলতাম, 'কেন তোমার রাজ অতিথির বুঝি এ প্রাসাদ পছন্দ হবে না?'

অসীমা লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে বলত, 'আহা।'

তারপর মুখ তুলে বলত, 'হবেই তো না। এই স্যাঁৎসেতে ঘর, আলো নেই বাতাস নেই। এখানে সে এসে কেন থাকবে শুনি।'

আমি বলতাম, 'তাই তো। দেখি চৌরঙ্গীতে তার জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে পারি কিনা।'

অ্যাডভানসড স্টেজে এসে অসীমার শরীরটা খারাপ যেতে লাগল। প্রায়ই শুয়ে থাকে, মাথা তুলতে পারে না। পেটে যন্ত্রণাও আছে। আমি ডাক্তার দেখালাম। তিনি বললেন, 'কোন ভয় নেই। প্রথম প্রথম এরকম অনেকেরই হয়।'

অসীমা ওর মামা বাড়িতে যেতে চাইল না। ওর তবু দূর সম্পর্কের এক মামা আছে। দূর দিগন্তেও আমি কোন আত্মীয়স্বজনকে দেখলাম না যেখানে ওকে নিয়ে তুলতে পারি। তাই সেই বাসাতেই আমার সাধ্যমত ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলাম। ঠিকে ঝি ছিল, তার বদলে রাত দিনের লোক রাখলাম। শুধু অফিসের আয়ে সব খরচ কুলোয় না। টুইশনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে অসীমা ঘর দোর আসবাবপত্রের দিকে পরম মমতাভরা চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমাকে আস্তে আস্তে বলল, 'ধরো আমি যদি মরে যাই?'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কী যে বলো। যারা এজন্যে হাসপাতালে যায় তারা বুঝি মরে? না কি আর একটি জীবন নিয়ে ফিরে আসে?'

অসীমা বলল, 'সবাই তো আর তা আসে না। ধরো এমন সঙ্কট যদি আসে দুজনের বাঁচবার আর কোন সম্ভাবনা নেই, ডাক্তার তোমাকে এসে বললেন, 'যে কোন একটিকে আপনি রাখতে পারেন। হয় মূল না হয় ফুল। আপনি কী রাখবেন বলুন।' আমি তোমাকে বলে যাই তখন কিন্তু তুমি ফুলই রেখো। আমি সেই ফুলের মধ্যেই বেঁচে থাকব। তার মধ্যেই তুমি আমাকে পাবে।'

এসব প্রিমনিশন অসীমার কেন এসেছিল জানিনে। হাসপাতালে কোন অঘটন ঘটল না। তবে ঈজি ডেলিভারি হল না। ডাক্তারকে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিতে হল। আমি অবশ্য মূল আর ফুল বলা যায় লতা আর ফুল দুইই জীবন্ত পেলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ডাক্তার জানিয়ে দিলেন লতা আর দ্বিতীয়বার পুষ্পিতা হবে না। সেই ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিয়েই ডাক্তার ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। একথা অবশ্য অসীমা অনেক পরে জেনেছিল।

মেয়ে নয় ছেলেই হয়েছে। সে ছেলে স্বাস্থ্যবান সুন্দর। রোগাটে হয়নি, ওজনে কম হয়নি। মাকে কষ্ট দিয়ে এসেছে বলে শিশুর মুখে কোন কুণ্ঠা সংকোচের ছাপ নেই। ডাক্তার আমাদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন। আমিও স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরলাম। কয়েক মাস পরে বাড়িও বদলালাম। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাট অবশ্য নয়, সিমলা স্ট্রীটে দোতলার ওপরে দুখানা ভালো ঘর দেখে আমরা উঠে গেলাম। পূব দক্ষিণে দুটি করে জানলা আছে। আলো হাওয়ার কোন অভাব নেই। স্ত্রীকে বললাম, 'দেখতো রাজপুত্রের উপযুক্ত প্রাসাদ হয়েছে কিনা।'

অসীমা বলল, 'প্রাসাদ তো হল। কিন্তু তুমি চালাবে কী করে। এত খরচ বাড়িয়ে ফেললে। সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি বদলাবার কী দরকার ছিল।'

দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'দরকার ছিল বই কি।'

ছোট একটি সংসার তো নয় এক সাম্রাজ্য। আমি আমার সমস্ত শক্তি সেই সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করলাম। পার্টটাইম চাকরি, টুইশন, মাঝে মাঝে কাগজে আর্টিকেল লেখা—উপার্জনের কোন পথই বাকি রাখলাম না। এই বৃহৎ বিশাল পৃথিবীতে আমরা আর কীই বা পারি। একটি ছোট্ট সংসারকে যদি সুন্দর সার্থক করে গড়ে তুলতে পারি তাই যথেষ্ট। আমার দেশকে

সমাজকে একটি সুস্থ সবল, সুশিক্ষিত নাগরিক যদি আমি দিয়ে যেতে পারি সেই আমার শ্রেষ্ঠ দান। অন্যের ক্ষতি না করে কোন অসৎপথে না গিয়ে কোন ছলনা বঞ্চনার আশ্রয় না নিয়ে তুমি যদি একটি সৎ সমর্থ উত্তর পুরুষ রেখে যেতে পার সে তোমার কম পৌরুষের কথা নয়।

পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হইনে। কারণ আমার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য স্থির আছে। যত শ্রান্ত হয়েই আমি ঘরে ফিরি বাচ্চুকে দেখলে আমার যেন কোন আর অবসাদ থাকে না। বহুকাল আমি খেলাধুলো ভুলে গিয়েছিলাম। আমি নতুন খেলার উৎসাহ আর বস্তু পেয়ে গেছি। আমি ওকে নিয়ে খেলি, আদর করি, কথা শেখাই। অসীমা অভিমানের ভান করে বলে, 'আমার চেয়ে ছেলেই তোমার বেশি আপন হল দেখছি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। এখন আর আমাকে দিয়ে তোমার দরকার নেই।'

বাচ্চু বড় হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ির আর সব ভাড়াটের ঘরেও ওর খুব আদর। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু এমন লাভলি চাইল্ড আর কারো ঘরে নেই।

হঠাৎ অসীমা একদিন আমাকে বলল, 'আচ্ছা, আমাদের বাচ্চুর কী হল বল দেখি।'

'কী হল।'

'ওর বয়সী সব ছেলেমেয়ে হাঁটছে, সারা বাড়ি ভরে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু ও হাঁটতেও পারছে না, কথাও বলতে পারছে না।'

আমি বললাম, 'বোধ হয় একটু দেরিতে হবে। ওর বাবা হাঁটতে শিখেছিল চার বছরে। আর ওর মার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শেখেনি।'

অসীমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠাট্টা তামাসা রাখো। চলো ওকে আমরা ভালো কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। রকম সকম আমার যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমাদের কপালে কী আছে কে জানে।'

গেলাম ওকে নিয়ে স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে ভরসা দিয়ে বললেন, 'না, আপনার ছেলে খোঁড়া হবে না বোবাও হবে না। দেখছেন না ও সব শুনতে পাচ্ছে। কালা নয়।'

পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চু হাঁটতেও পারল। ওকে আমরা কাছাকাছি ভালো একটা স্কুল দেখে ভর্তি করে দিলাম। ফার্স্ট সেকেন্ড না হলেও ও মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেই ক্লাস টু পর্যন্ত উঠল। তারপর আর পারল না। দু দুবার ফেল করল। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বোকা, জড়বুদ্ধি ছেলে। লজ্জায় দুঃখে আর বাঁচিনে। হেডমাস্টার বললেন, 'আসলে ওর কোন দোষ নেই। ও

বুদ্ধিতেই বেড় পায় না। আপনারা ওকে স্পেশালিস্ট দেখান। মনে হয় গোড়া থেকে ভালো করে চিকিৎসা করলে সেরে যাবে।'

ছুটে গেলাম আর এক স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি বাচ্চুর মার সামনে কিছু বললেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ একেবারে কনজেনিটাল ডেফিসিয়েনসি। জন্মগত। ব্রেণের গ্রোথ একেবারে চেকড হয়ে গেছে। আর বাড়বে না। যদি বা বাড়ে খুবই আস্তে আস্তে বাড়বে।'

অসীমাকে আমি তখন আর কিছু বললাম না। কিন্তু পরে সবই খুলে বললাম। সুখের আশায় এক সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। দুঃখ দুর্ভোগও এক-সঙ্গেই ভুগব। লুকিয়ে লাভ কি।

ওর চিকিৎসার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। সঞ্চয় তো কিছু ছিল না। ধার দেনা করতে লাগলাম। স্ত্রীকে দুচারখানা গয়না যা দিয়েছিলাম গেল। ঘরে দুটি একটি দামি আসবাবপত্র যা ছিল, রইল না। তবু যা চাইলাম তা আর হল কই। যে যাঁর নাম করল তাঁর কাছেই গেলাম। স্পেশালিস্ট, ফিজিওলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট সকলের কাছে ছুটোছুটি করলাম। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হল, শয়ে শয়ে টাকা ব্যয় হল: কিন্তু আর কিছুই হল না। ডাক্তাররা আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'ও ঠিক ইডিয়ট নয়, তবে—।'

তবে যে কী তার অনেক বৈজ্ঞানিক টার্ম আছে, ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু কোন প্রতিষেধক নেই। এই জড়বুদ্ধি ছেলেটির জড়তা যে কবে ঘুচবে কিসে ঘুচবে তা তাঁরা বলতে পারলেন না। আমরা বুঝতে পারলাম কোনদিনই ঘুচবে না।

আশ্চর্য, অসীমা এই দুর্ভাগ্যকে সহজেই মেনে নিল। ছেলের আদর যত্ন যেমন করত তেমনি করতে লাগল। যেন তার ছেলে আরো পাঁচজনের ছেলের মতই সুস্থ, স্বাভাবিক, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা। কিন্তু আমি তা পারলাম না। দুর্বল সন্তানের ওপর মায়ের নাকি সবচেয়ে বেশি স্নেহ থাকে কিন্তু বাপের তেমন অবিমিশ্র স্নেহ থাকতে পারে না। ছেলের দৌর্বল্যের মধ্যে বাপ নিজের বিকৃত প্রতিকৃতিকে দেখে, নিজের পঙ্গুতা অক্ষমতা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়।

আমি যে আমার ছেলেকে মারধোর করি তা নয়, কোনদিনই করি নি। কিন্তু তেমন মমতাও বোধ করি নি। বরং এক নির্মম ঔদাসীন্য আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অসীমা ওকে যেমন শাসন করে তেমনি আদরও করে, জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। উনিশ উৎরে বিশে পা দিয়েছে বাচ্চু। বয়সে সে যুবক, আকৃতিতেও তো তাই। গোঁফ দাড়ি গজিয়ে গেছে। তবু ওর মা ওকে শিশুর মতই আদর করে। ওর মনের বয়স সাত আট বছরের বেশি বাড়েনি।

ওর খেলাধুলো চালচলন সব বালকের মত। সাত আট বছরের ছেলেমেয়েরাই ওর সঙ্গী, তাদের সঙ্গে ও পুতুল খেলে, ছুটোছুটি করে। পড়াশুনোও ওই বয়সী ছেলেদের মত। অনেকদিন আগেই আমি ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি, প্রাইভেট টিউটরও ছাড়িয়ে দিয়েছি। কী হবে আর অর্থব্যয় করে।

কিন্তু আমি দূরে সরে থাকতে চাইলে কী হবে বাচ্চু আমাকে দূরে থাকতে দেয় না। আমাকে দেখলেই আমার গায়ের ওপর ও ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যেমন তোমার ভাইপোর গালে গাল ঘষছিলে, তেমনি ওর দাড়িওয়ালা গাল আমার গালের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে আদর করে। অবশ্য কচি দাড়ি তবু দাড়িই তো। আমার সর্বাঙ্গ অস্বস্তিতে ভরে যায়। ঘৃণা, লজ্জা, অসহায়তার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যেতে থাকি। আমি ওকে দুহাতে দূরে সরিয়ে দিই। আমি ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে যতদূর পারি চলে যাই। তুমি ত্বকের ব্যবহারের কথা বলছিলে অমরেশ। শুধু ত্বকের কোন দাম নেই। যেমন শুধু দৃষ্টি মানে শূন্য দৃষ্টি, সুধাভরা দৃষ্টি নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনঃপূত করা চাই তবেই সব জীবন্ত হয়; নইলে মৃত। শুধু ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মিলনে আমরা কী পাই। প্রায় কিছুই নয়। সেই সাময়িক সংলগ্নতার স্বাদ কি আমরা জীবন ভরে মনে রাখতে পারি? তাও না। তবু তুমি যা বলেছ এই ত্বকের জন্যেই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আমরা সবাই মাংসাশী। কাঁচা মাংস, নিত্য নতুন মাংস আমাদের লুব্ধ করে: পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে নতুন মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এই জন্যেই কি পৃথিবীর নাম মেদিনী? সে মনোময়ী নয়, শুধু মেদময়ী।

অসীমার গুণ আছে, মনের বলও আছে। জড়বুদ্ধি ছেলের শোকে সে নিজে জড় হয়ে বসে রইল না। শুধু ঘর সংসারের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখল না। নিজের চেষ্টায় ঘরে বসে পড়াশুনো করে ও ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ. তারপর বি. এ. পাশ করল। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে পাড়ার হাই স্কুলে একটি টিচারিও নিল। যারা জড়বুদ্ধি নয়, সুস্থ-স্বাভাবিক তীক্ষ্ণধী, সেই সব মেয়েকে পড়িয়ে ওর আনন্দ। নিজের কাজে খানিকটা সুখ্যাতিও অসীমা পেল।

আর আমি কী করলাম জানো? অফিসের চাকরি ছাড়া আমার একমাত্র কাজ হল জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পড়াশুনো, তথ্য সংগ্রহ। কোথায় কোন বইতে ওদের সম্বন্ধে কী লেখা আছে, কোন সাহেব কী অভিমত দিয়েছেন আমি তাই পড়ি, তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি।

একবার একটি বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়লাম এসব ছেলেমেয়েকে ওখানকার এক গভর্ণর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও নাকি করেছিলেন। কারণ যারা যোগ্য, সুস্থ সবল পৃথিবীতে শুধু তাদেরই জায়গা থাকা উচিত। যারা জড় বংশ জড়িয়ে তারা শুধু জড়তারই বিস্তার করবে।

অসীমাকে একথা বলায় সে আমার হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি. তুমি কি বাপ না জহ্লাদ?' আমি বললাম, 'আমার ওপর কেন রাগ করছ? আমি তো আর ওকথা বলিনি। যিনি বলেছেন, সেই গভর্ণরকে তুমি ফাঁসী দাও।' অসীমা তারপর দুদিন আমার সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

আমি যে সত্যিই জহ্লাদ নই ছেলের জন্যে খেলনা এনে দিয়ে, খাবার এনে দিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আমি তার প্রমাণ দিলাম।

পাড়াপড়শীদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ছেলেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হল, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেল আর আমি যুবকবেশী এক শিশুকে আঁকড়ে রইলাম।

দেখ, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বই লিখতে জানিনে, ছবি আঁকতে জানিনে, কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনে, মরবার পর যা আমাদের চিহ্ন ধরে রাখবে অন্তত কিছুদিনের জন্যে কিছু লোকের মনে রাখলেও রাখবে। আমরা বাঁচতে পারি শুধু আমাদের সন্তানের মধ্যে। সেই সন্তান যত কৃতী হয়, সার্থক হয় আমাদের মনুমেণ্ট গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় আত্মপ্রসাদ এই স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমার বেলায় অন্যরকম হল। সন্তান আমাদের স্মৃতিসৌধ নয়, শুধু কবরের গহ্বর।

বাচ্চু বুদ্ধিতেই জড়, কিন্তু বস্তুর মত জড়পিণ্ড নয়। ওর মন আছে, হৃদয় আছে। প্রাণোচ্ছল, চঞ্চল বালক। ও যদি আকারে না বাড়ত তা হলে হয়তো ওকে আমি ভালবাসতে পারতাম। আমি না বাসলেও ও কিন্তু ভালবাসে। প্রচণ্ড আবেগ দিয়েই ভালবাসে। ওর মাকে ভালবাসে, আমার বয়সী যাদের ও কাকা বলে ডাকে তাদের পরম আত্মীয় বলে মনে করে। বুদ্ধির সঙ্গে কোথায় যেন আবেগের বিরোধিতা আছে। যেখানে আবেগের আধিক্য সেখানেই বুদ্ধির ক্ষীণতা। ওর বুদ্ধি নেই বলেই বোধ হয় আবেগের পাত্র এমন কানায় কানায় ভরা।

কিছুদিন আগে একটি ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম এই ধরনের ছেলেদের সেকস্ ইমপালস বাড়ছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় যৌনবোধ যদি স্বাভাবিকভাবে আসে তাতে সুফল ফলতে পারে।

আমি আমার স্ত্রীর কাছে বাচ্চুর যৌনচেতনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

অসীমা তো লজ্জায় লাল। ওতো জানে না যা দোষ তাও কখনো কখনো গুণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে নিরাশ করল। বাচ্চুর ওসব কিছু হয় না। আসলে মনের যৌবনই যৌবন। সেই মনোরাজ্যে ও বালক মাত্র। সেখানে ও আজও যুবরাজ নয়। তবু আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলাম।

সেদিন বছরের শেষ বলে আমি ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বাড়ি বসে আছি। অসীমা গেছে স্কুলে। আর বাচ্চু ঘরের মধ্যে বসে পীজবোর্ড দিয়ে এক ঘর বানাচ্ছে। শিশুর খেলাঘর।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে ঢুকল। বয়স আর কত হবে! আঠের কি উনিশ। আমি ওকে চিনি। আমাদের পাশের বাড়ির সনতবাবুর ছোট শালী রেবা। দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

রেবা আমাদের দেখে ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একখানা গল্পের বই নিতে এসেছিলাম। মাসীমা কোথায়?'

অসীমাকে ও মাসীমা বলে ডাকে।

আমি বললাম, 'সে তো স্কুলে গেছে। এসো, ভিতরে এসো।'

রেবা ঘরে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে এক বৃহৎ শিশুর খেলা দেখতে লাগল। মেঝেয় বসে বাচ্চু পীজবোর্ড দিয়ে নতুন ঘর বাঁধছে।

আমি ওকে সচেতন করবার জন্যে বললাম, 'বাচ্চু, কে এসেছে দেখতো।'

বাচ্চু মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে একটু ফিক করে হেসে বলল, 'জানি। নতুন মা।' তারপর ফের সে তার ঘর তৈরী খেলায় মন দিল।

মুহূর্তের জন্যে সেই অষ্টাদশী তন্বী, রূপবতী মেয়েটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। তার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। নারীর এই লজ্জায় এই শোভন যৌবনশ্রী আমি যেন এই প্রথম দেখলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল বাচ্চুর মত আমারও গ্রোথ বন্ধ হয়ে গেছে। বয়সে আমি বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়; মন আমার বাইশ বছরের আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

রেবা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলতে হয় ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার তো পালাবার জায়গা নেই। পলাতকাকে ধরাই আমার একমাত্র কাজ। রেবা দুদিন বাদেই তার দিদির বাড়ি থেকে চলে গেছে। আর

আমি মনে মনে আজও সেই শরীরিনী হরিণীর পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি।'
সতীকান্তবাবু থামলেন।

ঘরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল।

অমরেশ আলো জ্বাললেন না, কোন কথা বললেন না। নিঃশব্দে বন্ধুর হাতে শুধু আর একটি সিগারেট গুঁজে দিলেন।

॥ ঝড় ॥

জানলা দিয়ে জোর জলের ঝাপটা আসছে আর ঝড়ের শব্দ। শুয়ে শুয়ে ঝড় দেখতে পাইনে। জানলার বাইরে গাছগুলি বড়ই লম্বা লম্বা আর ফুলের চারাগুলি খুবই ছোট। তাই ওরা কিরকম বেঁকে যায়, মাথা নোয়ায়, ডালগুলি ভেঙে মুচড়ে যেতে থাকে, তা এই বিছানা থেকে আমার চোখে পড়ে না। ঝড় আমাকে দেখা দেয় না, শুধু শব্দ শোনায়।

'জানলা দেওয়ার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা। নাইবা দিলে। থাক না খানিকক্ষণ খোলা।'

'তাই কি হয়, তোর সব ভিজে গেল যে।'

'কিছুই ভেজেনি মা, আমি যে শুকনো সেই শুকনোই আছি।'

'হ্যাঁ, শুকনো না আরো কিছু। বৃষ্টির ছাঁট এসে সব ভিজিয়ে দিয়েছে। এরা সব গেল কোথায়। কী যে আক্কেল এদের!'

'দুটি জানলাই বন্ধ করে দিলে মা?'

'দেব না, তোর ঠাণ্ডা লাগবে যে! একটু কিছু খা এখন। এক কাপ দুধই না হয় খা।'

'না।'

'আঙুর আনিয়ে রেখেছি, খাবি গোটাকয়েক?'

'না মা।'

'তোর কেবল না আর না। না খেলে শরীর সারবে কী করে বল তো?'

'আমার না খেয়ে খেয়েই সারবে।'

'তোমার বাপু কেবল জেদ আর জেদ। কাউকে ডেকে দিয়ে যাব? রিনু, অনু, জয়ন্তী কারো সঙ্গে গল্প করবি?'

'না মা।'

'আমিও যে তোমার কাছে একটু বসব তার জো নেই। বিনুর ছেলে দুটি এমন হয়েছে আমার হাতে ছাড়া খাবে না। কী যে মুশকিলে।'

'তুমি ওদের খাইয়ে দিয়ে এসো মা। তোমাকে এখন আর এখানে বসতে হবে না।'

'রেডিও খুলে দিয়ে যাব?'

'না।'

'বইটই পড়বি একখানা? দিয়ে যাব?'

'না।'

'একেবারে কিছু যদি না নিয়ে থাকিস তাহলে তো শুয়ে শুয়ে শুধু রাজ্যের ভাবনা ভাববি।'

'তুমি ভেব না মা, আমি কিছু ভাবব না। তুমি যাও ওদের খাইয়ে এসো। আমি ততক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঝড়ের শব্দ শুনি।'

তুমি কী রকম রাগ করে চলে গেলে। আমি রাগ করলে তুমি আর আজকাল হাস না কিন্তু তোমার রাগ দেখলে আমার মাঝে মাঝে বড় হাসি পায় মা। তুমি এইটুকুতেই রেগে অস্থির? আর আমি যে আজ সাত বছর শুয়ে আছি, আমি রাগ করব কার ওপর? ভাগ্যের ওপর? ছি ছি ছি, ভাগ্য কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও যে লজ্জা হয়। আমার মত একুশ বছরের লেখাপড়া জানা মেয়ে কি ভাগ্য মানে? ভাগ্য না দুর্ঘটনা। আমি কি দুর্ঘটনার ওপর রাগ করব? কয়েকদিনের জ্বরে অজ্ঞান হয়ে রইলাম তারপর আস্তে আস্তে আমার সব শরীর অবশ হয়ে গেল। একটা দুর্ঘটনা। না কার অ্যাকসিডেণ্ট নয়, ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট নয়, প্লেন-ক্রাস নয়, তবু সব ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে যাওয়া। এও এক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা বড় খটোমটো শব্দ। আমি যদি কবিতা লিখতাম, আগে লিখতাম—সেই সাতবছর আগে। দুটো খাতা ভরে ফেলেছিলাম। এখন আর পারিনে—কলম ধরতেই পারিনে। আর তাই চিঠি লিখতে পারিনে, নিজের হাতে ডায়েরি লিখতে পারিনে। আমার লেখাই এখন মনে মনে লেখা, মনে মনে লেখা আর মনে মনে মুছে ফেলা। না, মুছে ফেলবার দরকার হয় না। আপনিই মুছে যায়। আকাশের মেঘের মত। মেঘে মেঘে কত নদী কত হ্রদ কত সাগর কত পর্বত। তারপর সব অন্ধকার। কালো শ্লেটের মত, দিদিমণিরা আসবার আগে হাইস্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের মত। তখন কত কবিতা লিখেছি। স্কুলে থাকতে। অবশ্য খুবই কাঁচা। এখন লিখলে আর অমন কাঁচা কবিতা লিখতাম না, কুকুর নিয়ে বিড়াল নিয়ে স্কুল নিয়ে বড় দিদিমণিকে নিয়ে ছড়া লিখতাম না। এখন লিখলে কী লিখতাম। যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যে দুর্ঘটনা ঘটে রয়েছে তাই নিয়ে লিখতাম। কিন্তু দুর্ঘটনা কথাটা বসাতাম না। বড় শ্রুতিকটু। তার চেয়ে ভাগ্য এমন কি দুর্ভাগ্য ভালো। হোক সেকেলে। কিন্তু মানে তো একই। আর কানে তো ভালো শোনায়। আমি কি দুর্ভাগ্যের ওপর রাগ করব? যাকে আমি ধরতে পারিনে, ছুঁতে পারিনে, আঁচড়াতে কামড়াতে পারিনে, তার ওপর রাগ করে কী লাভ? আমি কি ডাক্তারদের ওপর রাগ করব? তাঁরা কি ভুল চিকিৎসা করেছিলেন? কিন্তু দাদারা তো বেছে বেছে এই শহরের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারই এনেছিলেন। শুরুতেই বড় ডাক্তার এনেছিলেন। দাদারা তো কোন

কৃপণতা করেননি। এই সাত বছর ধরে তাঁরা আমার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। দাদারা ডাক্তার বদলাচ্ছেন, ডাক্তাররা ওষুধ বদলাচ্ছেন, চিকিৎসার ধারা বদলাচ্ছেন। আমিই শুধু বদলাচ্ছি না। আমি তাহলে রাগ করব কার ওপর? দাদাদের ওপর না। তাঁরা খুব ভালো। মার ওপর না। মা খুব ভালো। তবে কি ডাক্তারদের ওপর? তাঁরা কেন ভুল করলেন? অবশ্য ভুল করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ভুল যদি না করে থাকেন আমার অসুখ সারছে না কেন। তাহলে স্বীকার করুন আপনাদের ক্ষমতা নেই। তাই আমার রোগ যতদিন আছে আমার চিকিৎসাও ততদিন আছে। ভাবতে মন্দ লাগে না—আমি যেন এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে রোগ-সৈন্য আর একদিকে ডাক্তারদের দল। তাঁদের হাতে আধুনিক সব মারণাস্ত্র। অ্যাটম বম্ব, হাইড্রোজেন বম্ব। আমার রোগকে ওঁরা বলছেন পলিনিউরেসথেনিয়া। বাব্বা, কি লম্বা নাম। আমার রোগও আমার মত মেয়ে। স্ত্রীয়ামাপ। ও আমার সর্বাঙ্গে স্নায়ুতে স্নায়ুতে মিশে রয়েছে। ও আমাকে ভালো-বেসেছে। আমাকে ছেড়ে নড়তে চায় না। সতীনের ভালোবাসা। সতীন, কী বিশ্রী কথা। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি। তাঁদের আমলে সতীন থাকত, মার আমলে নেই। বাবা মা ছাড়া আর কোন মেয়েকে ভালোবাসতেন না। বউদিদের আমলেও ও-আপদ চুকে গেছে। বউদিদের সতীন নেই। কোনদিন সতীন হতেও পারবে না। আইন তাদের পথ আটকে রাখবে। কিন্তু বান্ধবীদের পথ আটকাতে পারবে না। বড়দার বান্ধবীদের দেখলে বড়বউদির মুখ কী রকম ভার হয়ে যায়। চোখের ভাব অন্য রকম হয়। আমি সব দেখতে পাই, সব বুঝি। আমাদের দেখতে সবাই তো আসেন। তাঁরা আমাকে দেখেন, আমি তাঁদের দেখি। ছোড়দা ভারি চালাক। কোন মেয়ে বন্ধুকে পারতপক্ষে বাড়িতে আনে না। বাইরে বাইরে ঘোরে। ছোটবউদির রাগটা তাই চাপা। ঝগড়াটাও চাপা। স্বামীর বান্ধবীরা আজকাল স্ত্রীর আধা সতীন। আধা না হোক সিকি সতীন। আমার সে ভয় নেই। আমার সিকিও নেই, দু-আনিও নেই। ছটাকও নেই, কাঁচ্চাও নেই। বন্ধু থাকলে তো তার আর এক বান্ধবীর ভয়? স্বামী থাকলে তো তার ভালোবাসা নিয়ে ভাগাভাগি। আমার ছেলে বন্ধু নেই। মেয়ে বন্ধুরাই বা কোথায়। পর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে। বরুণা এম. এ. পড়ে। কিন্তু আমার আর খোঁজ নেয় না। তার এখন কত বন্ধু। বোধহয় ছেলে বন্ধুই বেশি। পাড়ার ছেলেরা আমারই কম বন্ধু হতে চেয়েছে? তখনো আমি ফ্রক ছাড়িনি। মাঝে মাঝে শুধু শখ করে শাড়ি পরি। সেই তখন থেকেই। কত ভাবেই যে ভাব জমাতে চাইত। আমি তখনই কিছু কিছু বুঝতে পারতাম। এখন আরো ভালো করে বুঝতে

পারি। এখন আর কেউ আসে না। না এলো। তাদের কারো ওপর আমার রাগ নেই। এই সাত বছরে আমি সবাইকে ভুলেছি। তাদের ওপর আমার রাগ নেই, ডাক্তারদের ওপর রাগ নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে বড় রাগ করতে ইচ্ছে করে। বুঝতে পারিনে কার ওপর রাগ করব। অদৃষ্টের ওপর রাগ করাই ভালো। কিন্তু অদৃষ্ট কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়। বড় সেকেলে কথা। আমি সেকেলে হতে চাইনে। তাছাড়া যাকে দেখতে পাইনে ধরতে ছুঁতে পাইনে বুঝতে পর্যন্ত পারিনে তার ওপর রাগ করা না করা সমান কথা। তাই যাদের দেখি তাদের সবাইর ওপর মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর রাগ হয়। ইচ্ছে হয় তাদের সবাইকে তৃণ কুটোর মত কুটি কুটি করি, দাঁত দিয়ে কামড়াই, নখের আঁচড়ে রক্ত বের করে দিই, সবাইকে শেষ করি। আমার এই অবস্থার জন্যে কাউকেই আলাদাভাবে দায়ী করতে পারিনে, তাই সবাইকেই আসামী সাব্যস্ত করি।

'শুক্লা, একেবারে চুপচাপ শুয়ে আছ যে।'

'চুপচাপ থাকবো না তো কী করবো ছোটবউদি।'

'তা ঠিক। তোমার এখন চুপ করে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তোমার যেমন চেঁচামেচি করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউদি।'

'কী করব ভাই, মেয়েটা বড় জ্বালায়। দিদির ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে। ছেলেমেয়ের কী যে জ্বালা তা তো আর বুঝলে না। মেয়েটা ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে বলে তোমার দাদার কী রাগ।'

ছোটবউদি কী চালাক তুমি। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে নিলে! ভেবেছ ছেলেমেয়ের কথা তোলায় আমি মনে দুঃখ পেয়েছি। আমি যদি ভালো থাকতাম, তোমাদের মত এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতাম কিনা। এম. এ. পড়তাম। পাস করতাম—প্রফেসারি করতাম। তারপর যা হবার হত। বিয়ে হলেও এত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ে হতে দিতাম কিনা।

'জানো শুক্লা, খালি কি মেয়ের ওপর রাগ। আমাকেও আজকাল দু'চোখ পেতে দেখতে পারে না। কেবল বলে মোটা হয়ে যাচ্ছ। আমি মোটা হচ্ছি আর তুমি পাল্লা দিয়ে রোগা হচ্ছ শুক্লা। ভালো করে খাওনা-দাওনা, হবে না এমন? আমার ইচ্ছে করে কি জানো? আমার গায়ের মাংস কেটে কেটে তোমার হাতে পায়ে লাগিয়ে দিই। তাতে যদি তোমার শরীর সারে।'

'খবরদার ছোটবউদি, অমন কাজও করতে যেয়ো না। অনর্থক ছোড়দার শরীর থেকে রক্তপাত হবে।'

'কেন তার রক্তপাত হবে কেন?'

'বাঃ রে, তোমরা যে অঙ্গাঙ্গী। তিনি তোমার অর্ধাঙ্গ। তুমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। একজনের মাংস কাটলে আর একজনের দেহে প্রাণ থাকবে

নাকি? তুমি বলছিলে তোমাকে দেখতে পারে না। এবারকার ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে গোপনে গোপনে কত টাকা দামের শাড়ি এসেছে শুনি? পঁচিশ না তিরিশ? এই বুঝি দেখতে না পারার নমুনা?'

'আহা শাড়িই বুঝি সব! এসো শুক্লা, তোমার চুল বেঁধে দিই। বাব্বা, কী চুলই না তোমার মাথায়। চুলের অরণ্য। তুমি যখন ভালো হয়ে উঠবে কতজনে এই চুল নিয়ে কবিতা লিখবে। কতজনের ইচ্ছে হবে ওই রাশ রাশ চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকতে।'

'যাক বউদি, একসঙ্গে অতগুলি লোক যদি আমার চুলের মুঠি এসে ধরে আমার মাথায় টাক পড়ে যাবে।'

'চুলের যত্ন না করলে এমনিই টাক পড়বে। এসো তোমার চুল বেঁধে দিয়ে যাই।'

'না বউদি, এখন না। এখন থাক। তোমার পায়ে পড়ি, একটু বাদে। ঝড়টা থামুক তার পরে।'

'ওমা, ঝড়ে তোমার কী করবে। তোমার দাদারা বাইরে—বোধ হয় এই ঝড়বৃষ্টির জন্যেই তাঁদের আজ দেরি হয়ে যাবে। তোমার চুলটা বেঁধে দিয়েই যাই। মা বললেন, আমার এখনো সব কাজ পড়ে আছে। ঘর ঝাঁট দিতে হবে, বিছানা পাততে হবে।'

'আঃ, যাও বলছি। যাও এখান থেকে। আমার জন্যে তোমাদের কারো কিছু করতে হবে না।'

'রাগ কোরো না শুক্লা, রাগ করলে তোমার শরীর আরো খারাপ হবে। কী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। সবাই বলে এতদিন ধরে ভুগছে তবু কী শান্ত মেজাজ। কী মিষ্টি কথা, আর কী সুন্দর মুখ। বাড়ির মধ্যে তুমি সবচেয়ে সুন্দরী শুক্লা। এত রূপ আর কারো নেই। মুখখানা ঠিক একেবারে ফুটন্ত পদ্মফুলের মত। ঠিক তেমনি রঙ।'

'পদ্মফুলের মত মুখ। আর দেহটা ঠিক তার ডাঁটার মত না বউদি? যাও, তুমি তোমার বিছানা পেতে এসো। তারপর আমি চুল বাঁধব। ঝড় থামুক—তারপর।'

ছোটবউদি চলে গেল। বিয়ের আগে আমি ওকে জয়ন্তীদি বলে ডাকতাম। খুব ভালো মেয়ে। আমার কত মুখঝামটা সহ্য করে। ছোটবউদি আমার বন্ধু, আমার সখী। আমি সীতা ও সরমা। আমি সীতা কিন্তু আমার রাম নেই। সীতাকে রাবণ রামের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল। আর আমার রাবণ আমাকে আগে থেকেই দশ হাতে আগলে রেখেছে পাছে রাম আসে। বউদি বিছানা পাততে গেল। বিছানা পাতায় ওদের কী আনন্দ!

ওদের বিছানা শুধু ঘুমোবার জন্যে আর আমার বিছানা দিনরাত সব সময়ের জন্যে। বিছানা আমার কাছে বিষ। আমি আর পারিনে। আর জেগে জেগে এমন করে শুয়ে থাকতে পারিনে। তবু কত যত্ন করে এই বিছানা আমার মা রোজ দুবার করে পেতে দিয়ে যান। কোন কোন দিন তিনবারও পাতেন। সব সময় তো কাছে থাকতে পারেন না। যেন নিজের কোলখানা সব সময়ের জন্যে পেতে রেখে যান। আমার মা সাদা থান পরেন। আমার বিছানার রং সাদা। আমার বিছানা আমার মায়ের কোল। আর বউদির বিছানা তার স্বামীর কোল। আমি কী করে জানলাম? আমি সব জানি। সব জানি। আমার দেহটা থেমে আছে মন তো আর থেমে নেই। সে অনেক বেড়েছে। অনেক— অনেক। বড়দা বলেন অসুখে তোর কিন্তু একটা মস্ত লাভ হয়েছে শুকু। বাংলা ইংরেজী কাব্য নাটক উপন্যাস কিছুই আর বাকী রাখিসনি। সাতটা বছরে তুই সাতটা এম এ পাস করেছিস শুকু। আমার তো একখানা বই ছুঁয়ে দেখবারও সময় নেই। জ্বর-জ্বারি না হলে কোন একখানা বই পড়তে পারিনে। বড়দা মেজদা আপনারা ইঞ্জিনিয়ার। আপনাদের নিজেদের ফার্ম আছে হেয়ার স্ট্রীটে। সব সময় ব্যস্ত। আপনাদের বই পড়বার সময় কোথায়। দরকারই বা কি। কিন্তু আমার তো না পড়ে উপায় নেই। বই আমার সঙ্গী। অবশ্য বড়দা যত বাড়িয়ে বলেন তত নয়। তত আমি পড়িনি। প্রথম প্রথম ইংরেজী পড়তে তো ভয়ই হত। ভয়ের চেয়ে বেশী হত লজ্জা। সবাই ঠাট্টা করবে। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। আর বিদেশী ভাষা তার সমস্ত রস আর রহস্য আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত। দুজনে মিলে লুকোচুরি খেলা। আমি তাকে ছুঁতে যাই আর সে পালায়। ছেলেবেলায় কত খেলেছি উঠোনে, পার্কে, পিকনিক পার্টিতে গিয়ে। বন্ধুরা আমার চোখ বেঁধে দিত। আমি ঠিক আন্দাজে আন্দাজে বের করে দিতাম কে আমার মাথায় টোকা দিয়েছে, কে আমার বিনুনী ধরে টান দিয়ে গেল। আমার আন্দাজ সবচেয়ে বেশি ছিল। পর্ণা বলত শুকু তুই একটা কুকুর! কুকুরের মত তোর শুঁকবার শক্তি। বই পড়ার বেলায়ও আমি আন্দাজে আন্দাজে এগিয়েছি। চোখে রুমাল বাঁধা। দেখতে পাইনে কিছু। একবার তো মল্লিকবাবুদের বাগানের দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে গেল। ইংরেজী বই পড়তে গিয়েও কতবার যে আমার মাথা ঠুকেছে তার ঠিক নেই। ডিকসনারি দেখে দেখে পড়েছি। কিন্তু ডিকসনারি হল মূর্তিমান রসভঙ্গ। না দেখলেও চলে না, আবার দেখতে গেলে ধৈর্য থাকে না। তারপর আমার চোখের রুমাল খুলে গেল। দেখি সামনে এক বিরাট দেয়াল। মাথা ঠুকতে ঠুকতে অনেক ফোকর বেরোল। অনেক জানলা। জানলা আর দরজা। হাজার দরজা।

সব খোলেনি। আস্তে আস্তে খুলছে। বিশ্ব-সাহিত্যের দোরগুলি আস্তে আস্তে খুলছে। আমি যখন ভালো হয়ে উঠব তখনও দোরগুলি বন্ধ হবে না। কিন্তু আমার জানলা দুটি এখনো বন্ধ। বৃষ্টি কি এখনো থামেনি? এখনো তার শোসানি আর ফোঁসফোঁসানি সমানে চলেছে।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

আবার কার ফোন এল।

বিছানার কাছেই ফোন। ইচ্ছা করলেই ফোনটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারিনে। কিন্তু বাজনা শুনতে ভালো লাগে। যিনি ফোন করছেন তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে ভালো লাগে। কে ফোন করছে? তিনি নন তো? এই ঝড়ের মধ্যে কি আমাকে মনে করেছে? কে আমাকে ফোনে ধরতে চাইছে? কে? কে? কে? কড়া নাড়ার শব্দ শুনলে আমি বুঝতে পারি কে। পায়ের শব্দ শুনলে চিনতে পারি কে আসছে। কিন্তু ফোনের বাজনা সব এক রকম।

'হ্যালো, কে আপনি? ওঃ ডক্টর দত্ত? আসতে পারবেন না? না না এই ওয়েদারে কী করে বেরোবেন? না, আজ এসে আপনার দরকার নেই। আপনি পরশুই আসুন। আমি ভালো আছি। বেশ আছি। ঠিক আছে। একদিন ম্যাসাজ বাদ গেলে আমার কিছু হবে না।'

ওঁর কি আর একটু কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত আমার ইচ্ছা করছে না। আমি ছেড়ে দিলাম।

ডাক্তার। ডাক্তার ছাড়া আমাকে কে ফোন করবে? উনি আসতে চেয়েছিলেন। আমি বারণ করে দিলাম। কী আর হবে ম্যাসাজ করে? একদিন বাদ গেলে কোন ক্ষতি হবে না। আজ তিন বছর ধরে উনি চিকিৎসা করছেন। ভারি তো লাভ হল! ডক্টর দত্ত কিন্তু ভালো লোক--ভদ্রলোক। সব সময় আমাকে ভরসা দেন তুমি সারবে--সেরে উঠবে। সারি আর না সারি সেরে ওঠার কথা শুনতে বড় ভালো লাগে। উনি সপ্তাহে তিনদিন আসেন। শুধু কাজ সেরেই চলে যান না। কাজের পরে বসে বসে গল্প করেন। অথচ ওঁর আরো কত কাজ পড়ে থাকে, আমার মত ওঁর আরো কত পেসেণ্ট। ওঁর বয়স যদি পঞ্চাশ পেরিয়ে না যেত, ওঁর ঘরে যদি বউ আর চারটি ছেলেমেয়ে না থাকত, আমি ভাবতে পারতাম উনি আমার প্রেমে পড়েছেন। দূর। উনি পড়লেই বা কি! আমি পড়তাম নাকি। ডক্টর আর নার্সের প্রেমের গল্প পড়েছি। পেসেণ্ট আর নার্সের প্রেমের গল্প পড়েছি। পেসেণ্ট আর ডাক্তারের--। না মনে পড়ছে না। বাজে কথা। লেখকদের যত সব বানানো কথা। যতক্ষণ আমি রোগিণী আমার প্রেমে শুধু রোগই পড়বে

আর কেউ না। পেসেণ্টকে যে ভালোবাসা তার মধ্যে শুধু স্নেহ সহানুভূতি আর অনুকম্পা। তার মধ্যে প্যাসন নেই। আমি চাইনে তোমাদের স্নেহ, চাইনে তোমাদের সিম্প্যাথি। সিম্প্যাথির ওপর পরম অ্যাপাথি আমার। ডক্টর দত্ত আমাকে কি করে ভালোবাসবেন? তিনি সবই দেখেছেন। ম্যাসাজের সময় সবই দেখতে দিতে হয়। অবশ্য মা সামনে থাকেন। মা আমার নার্স। আমার ধাত্রী, আমার ধরণী। আমার সব অঙ্গ আমার মা দেখেন, আমি দেখি আর ডাক্তার দেখেন। আর কেউ না—আর কেউ না। ডাক্তারই একমাত্র ভাগ্যবান পুরুষ, দুর্ভাগ্যবান পুরুষ যিনি আমার কুরূপও দেখেছেন। দেখুন। ওঁর কাছে আমার আর লজ্জা নেই। ডাক্তারকে সব দেখাতেও হয়, ডাক্তারকে সব শোনাতেও হয়। শুধু মন না খুললেও চলে। তিনি চাদর উলটে আমার শরীরের সব দেখতে পান, কিন্তু মনকে তো দেখতে পান না। আমি তাকে চাদরের পর চাদর চাপিয়ে ঢেকে রেখেছি। আর আদরের পর আদর। আমি নিজেই আমার মনকে আদর করি। আমার যে সুস্থ সুন্দর সবল মন অতিকষ্টে এই অসুস্থ দেহের মধ্যে বাস করছে তার দুঃখ আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? ডাক্তার কতটুকু বুঝতে পারেন? বুঝতে পারুন আর নাই পারুন ওঁর সহানুভূতি আছে। উনি আমাকে ধরে ধরে হাঁটান, ওঠ-বস করান। তারপর নিজে ঐ চেয়ারটায় বসে বসে গল্প করেন। প্রেমের গল্প নয়, ঘরকন্নার গল্প নয়। সেসব তো নভেলেই পড়ি। ওই বুড়ো মানুষের মুখে সে গল্প আর কী শুনব। উনি শিকারের গল্প বলেন, মাছ ধরার গল্প বলেন। মাছ ধরায় ওঁর খুব শখ। জলের জন্তু আর ডাঙ্গার জন্তু শিকার করতে গিয়ে কবে কোন বিপদে পড়েছিলেন আর বুদ্ধির জোরে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন—সেইসব গল্প। মাঝে মাঝে শুনতে মন্দ লাগে না। শুনতে শুনতে আমি আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাই। আমাকে আরো ছেলেমানুষ করে দেওয়াই বোধহয় ওঁর উদ্দেশ্য। আমি যেন এগারো বছরের খুকি। ফ্রক পরে ঘুরছি, বেড়াচ্ছি, ছুটছি, লাফাচ্ছি। ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু উনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বয়স বাড়তে থাকে। একুশ থেকে বাড়তে বাড়তে যেন একষট্টি, একাত্তর, একাশিতে গিয়ে পৌঁছায়। রাত্রির অন্ধকারে ভেবে ভেবে আমি শিউরে উঠি। যদি জেগে উঠে দেখি আমি বুড়ী হয়ে গেছি। যদি বুড়ো হওয়ার আগে আমার এই রোগ না সারে তাহলে কী হবে আমার—কী হবে।

কিন্তু রাত যখন ভোর হয় আর আমি আমার মুখ দেখি, আর আমার মায়ের হাসিমুখ দেখি—আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়।

ছোড়দার বন্ধু বেণুদা আমাকে আর এক রকম ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঝড়ের ভয়। অবশ্য শুধু ফোনে ফোনে। বউদিদিদের ভাই আর দাদাদের বন্ধু কতজনের সঙ্গেই তো ফোনে আলাপ করেছি। কিন্তু বেণুদার মত কথা বলতে কেউ জানেন না আর যেচে যেচে অত ফোনও কেউ করেন না। আমি নিজে একটু হিসেব করেই ফোন করি। অমনিতেই দাদারা আমার জন্যে কত খরচ করেন। ওঁদের খরচ আর বাড়াতে চাই না। ওঁরা আমার জন্য দামি রেডিও কিনে দিয়েছেন। তাতে আমি পৃথিবীর যে কোন বড় শহরকে ধরতে পারি। সেখানকার গান শুনতে পারি, বক্তৃতা শুনতে পারি। লণ্ডন, মস্কো, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, রোম, যে কোন বড় শহর আর পুরনো শহরকে আমি কানের ভিতর দিয়ে পাই। দাদারা রেডিওটা আমার ঘরে রেখেছেন, ফোনটা রেখে দিয়েছেন বিছানার পাশে। যাতে আমি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে পারি। কিন্তু সবাইর সঙ্গে গল্প করে কী আনন্দ আছে? সবাই কি গল্প করতেই জানে? বেণুদা কথা বলতে জানতেন। আর তার সেই হোটেল থেকে যখন তখন আমাকে ফোন করতেন। বেণুদার নাওয়া-খাওয়ার যেমন ঠিক ছিল না, কাজকর্মের কিছু ঠিক ছিল না। তেমনি ফোন করবার সময়ও কিছু ঠিক ছিল না। আর আমি সব সময় ঠিক হয়েই আছি। আমার সবই বাঁধাধরা! নাওয়া-খাওয়া ঘুমোন বিশ্রাম পড়াশুনো সব ডাক্তারের নিয়মে বাঁধা। তাই মনে মনে সবদিক থেকেই বেঠিক বেণুদাকে আমি বড় পছন্দ করতাম। আমি তাঁকে তিনবার মাত্র দেখেছি। ফর্সা ছিপছিপে চেহারা। বয়স দাদাদের চেয়ে কম। কিছুতেই তিরিশের বেশী না। আর দেখতে দাদাদের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তাঁদের মত গুণীও নন, বিদ্বানও নন। আমার মত বেণুদাও ডিগ্রীহীন। কিন্তু বাইরের পড়াশুনো খুব আছে, আর ঘুরতে খুব ভালবাসতেন। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ওঁর মুখে বাঁধা। মাসের মধ্যে দশ পনের দিন বেণুদা বাইরে কাটান। বিয়ে থা করেননি। মা বাবা নাকি বেনারসে থাকেন।

ছোটদাকে কতদিন জিজ্ঞেস করেছি 'বেণুদার কিসের বিজনেস?' ছোড়দা হেসে বলতেন, 'ওর কথা আর বলিসনে। ও একটা ফোরটোয়েণ্টি। আজ সিমেণ্ট, কাল প্লাস্টিক। ওর কোনটা যে ঠিক কোনটা যে বেঠিক ধরা শক্ত।' বড়দা বলেছিলেন, 'শুকুর সঙ্গে তুই আর আলাপ করিয়ে দেবার মানুষ পাসনি। কেন ও-ধরনের লোককে অ্যালাউ করিস।'

ছোড়দা বলেছিলেন, 'তাতে কি! বাড়ীতে তো আসে না। দূর থেকে শুকুর ও আর কী ক্ষতি করতে পারবে। শুকু ওর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে একটু মজা পায় তো পাক না।'

ক্ষতি! যেন কাছে এসেই আমার ক্ষতি করবার কারো সাধ্য আছে। আমার যেন কোন বুদ্ধি হয়নি। নিজেকে রক্ষা করবার মত শক্তি হয়নি।

বেণুদা খুব কথা বলতেন, খুব গল্প করতেন।

সেবার বলেছিলেন, 'তুমি যে কী করে অমন উদ্ভিদের মত এক জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে আছ আমি ভেবেই পাইনে শুক্লা।'

আমি বলেছিলাম, 'বাঃ রে, আমি ইচ্ছে করে বসে আছি নাকি?'

'জানি ইচ্ছে করে বসে নেই। একান্ত অনিচ্ছায় শুয়ে আছ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কী ইচ্ছে করে জানো? ঝড়ের মত উড়ে গিয়ে তোমাকে একেবারে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে আসি।'

'রক্ষে করুন বেণুদা—অমন ঝোড়ো-হাওয়া আমার সইবে না। আমি যে শুকনো পাতা।'

'তুমি কেন শুক্‌নো হতে যাবে শুক্লা। তোমার কথা এত সরস, তোমার গলার স্বর এত মিষ্টি! আমি তোমার গলা শুনব বলেই তো এত ঘন ঘন ফোন করি।'

'যাঃ, কি যে বলেন!'

মাঝে মাঝে মনে হত বেণুদা সত্যিই বড় নিষ্ঠুর। আমার মত মেয়েকে এসব কথা বলে লাভ কি। উনি কি বোঝেন না এতে আমার কত কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করে থাকত। তিনি কষ্ট না দিলে আমি যেন বেশি কষ্ট পেতাম। একমাত্র বেণুদাই আমার অসুখকে আমল দেন না: আমার রোগের কমা-বাড়ার খোঁজ নেন না। একমাত্র তাঁর কাছেই আমি সুস্থ সবল স্বাভাবিক মেয়ে। যেন আমি ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারি।

তিনি আর একদিন বলেছিলেন, 'আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমার খাটশুদ্ধ তোমাকে আমি পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসি, তারপর গরুড় পাখীর মত আকাশময় ঘুরে বেড়াই।'

আমি বলেছি, 'দোহাই বেণুদা, অমন কাজও করবেন না। আমি যত হাল্কা আমার খাট তত ভারী। আপনি ব্যালেন্স রাখতে পারবেন না।'

বেণুদা বলেছেন, 'আমি কোনদিনই তা পারিনে। সেই ভালো। আলাদা খাটের দরকার নেই। আমার পিঠই তোমার পীঠস্থান হোক।'

আর একদিন বোম্বে থেকে প্লেনে ফেরার পথে বেণুদা নাকি ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। এসে ফোনে সেই ঝড়ের গল্প। তিনি বললেন, 'কী বাম্পিংই যে হয়েছিল। আর একটু হলেই যেতাম আর কি। সেই ঝড়ের মধ্যে তোমার কথা আমার মনে পড়ছিল।'

'ওমা ঝড়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক।'

বেণুদা বলেছিলেন, 'তোমার সম্পর্ক বুঝি শুধু ঘরের সঙ্গে?'

সম্পর্ক যে ঝড়ের সঙ্গেও আছে তা আমি পরে টের পেয়েছিলাম। ছোড়দা সেদিন হঠাৎ এসে বললেন, চীটিং আর ফোর্জারির দায়ে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে বেণুদার নামে। আর তিনি অ্যাবস্‌কণ্ড করেছেন। সেদিন আমার বুকের মধ্যে ভীষণ একরকম ঝড় বইতে লাগল। সেকি সমুদ্রের ঝড় না আকাশের ঝড়—আমি জানিনে, বোধ হয় দুই-ই।

বেণুদা কি ধরা পড়েছেন? নিশ্চয়ই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। নইলে একদিন না একদিন ফোন করতেন। তিনি ফোন না করে থাকতে পারতেন না। কিন্তু কেন বেণুদা অমন করতে গেলেন। কেন তাঁর এমন দুর্মতি হল। আমার মত তিনিও কি অসুস্থ? আমি দেহে তিনি মনে। কিন্তু আমার অসুখের ওপর আমার তো কোন হাত নেই। আর বেণুদার? হতে পারে তাঁরও কোন হাত নেই। পুলিস তাকে মিছিমিছি ধরেছে। কিন্তু তাহলে—

তিনি পালিয়ে বেড়াবেন কেন? আমি আর ভাবতে পারিনে। ভাবলে আমার বুকের মধ্যে ফের কী রকম যেন ঝড় ওঠে। আমি তার ঝাপটা সইতে পারিনে। শরীর দুর্বল বলেই সইতে পারিনে। আমি কবে সুস্থ হব, সবল হব? তখন সব ঝড়-ঝাপটা সইতে পারব। ঝড়ের মধ্যে বেরোতেও পারব। মা এসে জানলা খুলে দিয়েছেন। বৃষ্টি কি থামল! এরই মধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলি জ্বলেনি। ঘরের আলোই বা জ্বাললে কেন মা। আমার অন্ধকারই ভালো।

'বিনু চিনু এসে গেছে। ওঃ কি ভেজাটাই ভিজেছে। এত করে বলি একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি অন্তত কিনে নে।'

দাদারা এসেছেন। এবার সবাই আমার ঘরে এসে বসবেন। এখানে বসে সবাই চা খাবেন। আমার সারাদিনের খবর নেবেন। আর জিজ্ঞেস করবেন, 'কেমন আছিস শঙ্কু।'

আমি জবাব দেব, 'ভালো আছি, বেশ ভালো আছি।'